গণতন্ত্র

For the Students • By the Students • Of the Students

January, 2022 | রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ষাণ্মাসিক ই-পত্রিকা | Vol. II, Issue II

প্রচ্ছদ প্রবন্ধ

'...এবং সুভাষচন্দ্র'

❶ স্বামী বিবেকানন্দের 'মন্ত্রশিষ্য' সুভাষচন্দ্র ❷ সুভাষচন্দ্র বসু ও নেতৃত্বের আদর্শ

❸ তরুণের স্বপ্ন ও সুভাষচন্দ্র ❹ দেশবন্ধু ও দেশনায়ক: ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে

❺ সুভাষচন্দ্রের লেখনী ও বাংলা সাহিত্য

ওটেন সাহেব (প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক) কর্তৃক সুভাষচন্দ্র বসুর সম্বন্ধে রচিত ইংরেজি কবিতা এবং তার বাংলা রূপান্তর।

নিয়মিত বিভাগ

- শ্রদ্ধা
- পুস্তক পর্যালোচনা
- সাম্প্রতিক ইস্যু
- বিভাগের অন্দরমহল
- ক্যুইজ
- প্রাক্তনী সমাচার

गीता

মুখ্য উপদেষ্টাঃ শ্রীকৌস্তভ ভট্টাচার্য্য, ভার-প্রাপ্ত অধ্যক্ষ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

উপদেষ্টা মণ্ডলীঃ পরিচলন সমিতির মাননীয়া সভাপতি সহ অন্যান্য সদস্য ও সদস্যা এবং একাদেমিক সাব কমিটির সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাবৃন্দ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

সম্পাদকঃ শ্রীপ্রসেনজিৎ সাহা, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

সহযোগী সম্পাদক মণ্ডলীঃ সফিউল ইসলাম খান, সহকারী অধ্যাপক। শ্রী স্বপন কুমার বিশ্বাস, সহকারী অধ্যাপক। মৃণাল সিংহ বাবু, স্টেট এডেড কলেজ টিচার। রিংকি বিশ্বাস, স্টেট এডেড কলেজ টিচার, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

পত্রিকাস্বত্বঃ করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ প্রকাশকাল : ২৩শে জানুয়ারি, ২০২২

দ্বিতীয় ভলিউম, দ্বিতীয় ইস্যু। (ই -পত্রিকা /ই-এডিসন) ।

পত্রিকায় উল্লিখিত বা লিখিত মন্তব্য লেখকের নিজের, প্রতিষ্ঠান বা সম্পাদকের নয়।

প্রকাশক: রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

মতামত বা অভিযোগ বা ম্যাগাজিন সম্পর্কে যেকোনো মন্তব্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
politicalscience@karimpurpannadevicollege.ac.in

Website Link: https://karimpurpannadevicollege.ac.in/Emagazine.aspx

@ পত্রিকা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন ব্যতীত পত্রিকার যে কোন অংশের অনুলিপি অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

প্রচ্ছদ ও ডি টি পি : শ্রী জয়ন্ত দত্ত, নবদ্বীপ ।

বিষয় সূচীঃ

সম্পাদকের কলমেঃ- 4

শ্রদ্ধা

১। সার্ধশতবর্ষে মাতঙ্গিনী হাজরা • অনন্যা পাল 5
২। দেশবন্ধু: সার্ধশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি • শ্রী সুপ্রভাত ঘোষ 7
৩। সার্ধশতবর্ষে রোজা লুক্সেমবার্গঃ এক অনন্য সমাজবাদী নেত্রী • বর্ষা খাতুন 10

সাম্প্রতিক ইস্যু

১। এক ঐতিহাসিক সত্যাগ্রহ-কৃষি আইন প্রত্যাহারের নেপথ্যে • রিঙ্কি বিশ্বাস 12
২। আফগানিস্তানে তালিবানি শাসন, ২০২১: নয়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে • শ্রী মৃণাল সিংহ বাবু 15
৩। গ্লাসগোর পরিবেশ সম্মেলন/COP-26 : পাওয়া না পাওয়ার হিসেব • অসম রেজা 18
ওটেন সাহেব (প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক) কর্তৃক সুভাষচন্দ্র বসুর সম্বন্ধে রচিত ইংরেজি কবিতা এবং তার বাংলা রূপান্তর • 21

প্রচ্ছদ প্রবন্ধ

১। স্বামী বিবেকানন্দের 'মন্ত্রশিষ্য' সুভাষচন্দ্র • শ্রী ব্রজ কিশোর ঘোষ 22
২। সুভাষচন্দ্র বসু ও নেতৃত্বের আদর্শ • শ্রী সমীর কুমার দাশগুপ্ত 26
৩। তরুণের স্বপ্ন ও সুভাষচন্দ্র • শ্রী অরুণাভ সেনগুপ্ত 30
৪। দেশবন্ধু ও দেশনায়ক: ইতিহাসের প্রেক্ষাপট • শ্রী অয়ন চক্রবর্তী 34
৫। সুভাষচন্দ্রের লেখনী ও বাংলা সাহিত্য • শ্রী শুভাশিষ পাল 38

ক্যুইজ বিভাগ

• সৌরভ স্বর্ণকার 40

পুস্তক পর্যালোচনা

১। ভারতীয় সংবিধান ও রাজনীতি রাজীব শ্রাবণ, ছায়া প্রকাশনী মার্চ, 2020 সংস্করণ • 42

বিভাগীয় উদ্যোগ

১। বিভাগীয় সেমিনার • 43
২। কৃতিত্ব বা বিশেষ পুরষ্কার অর্জন: • 44
৩। সমীক্ষার বিবরণ • 45

বিভাগের অন্দরমহল

50

প্রাক্তনী সমাচার

১। স্মৃতি ও ভালোবাসার অনুভূতির বিচারে
করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ • সঞ্জু মন্ডল 52

ক্যুইজের উত্তর

55

সম্পাদকের কলমেঃ-

অপরাজিত

সুভাষ এর মৃত্যুর রহস্য কে ফোকাস করতে গিয়ে আমরা তাঁর বাস্তব জীবনের সংগ্রাম, ত্যাগ, দেশপ্রেম, নেতৃত্বদানের কৌশল, অকুতোভয়, অনবদ্য সাংগঠনিক কুশলতা, ক্ষুরধার বুদ্ধি, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, সর্বোপরি তাঁর অদম্য সাহস ও স্পর্ধা কে এই প্রজন্মের ছাত্র ছাত্রী তথা যুব সম্প্রদায়ের কাছে সে ভাবে পৌঁছে দিতে পারিনি। কি ভাবে 'কর্ম' তাঁর কাছে 'যোগে' রূপান্তরিত হয়েছিল- সেই শিক্ষার ধারাকে আমরা বহন করতে পারিনি। আমারা ভারতবর্ষের যে তথাকথিত স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পড়ি সেখানেও এর বিস্তারিত বিবরণের বড় অভাব। দেশপ্রেম তো আর ওজনে মাপা যায় না। দেশপ্রেম অনুভব করতে হয়। ভারতবর্ষের জন্য দুটি আদর্শকে স্বামী বিবেকানন্দ রেখেছিলেন- একটি ত্যাগ আরেকটির সেবা। সুভাষের জীবনের এই দুটির অদ্ভুত সমন্বয় আমরা লক্ষ্য করেছি। একদিকে তাঁর বেপরোয়া ত্যাগ কার অন্যদিকে সীমাহীন প্রেম বা সেবা। আর একারণেই রবীন্দ্রনাথ তাকে 'দেশনায়ক' এর পদে বরণ করে নিয়েছিলেন। বারবার তিনি সাফল্যের চূড়ায় গিয়ে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছেন ,আর জয়ী হয়েছেন। শুরুর দিকে ভাবুন। আইসিএস পাস করলেন সসম্মানে, চাকরি নিলেন না । দু'দুবার কংগ্রেসের সভাপতি হলেন, কংগ্রেস ছাড়লেন। আবার দেশের মুক্তির জন্য দেশ ছাড়লেন। অন্তর্ধান এর পর মনে হলো তিনি বোধহয় হেরে গেলেন। কিন্তু কোথায়! তার প্রভাবেই ব্রিটিশ দেশ ছাড়লো। অন্ততপক্ষে সরকারি নথি তো সে কথা বলে। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর দুদিনের জন্য কলকাতা রাজভবনে অবস্থান করছিলেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সেসময় অস্থায়ী রাজ্যপাল ফণিভূষণ চক্রবর্তীর (ভূতপূর্ব বিচারপতি ছিলেন) তাঁর একটি সাক্ষাৎকার হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন এত তড়িঘড়ি করে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ ত্যাগ করলেন কেন? তার উত্তরে ক্লিমেন্ট এটলি উত্তর দিয়েছিলেন, "নেতাজি সুভাষ বসুর আজাদ হিন্দ বাহিনীর সংগ্রাম এবং তার প্রভাবের কারণেই আমরা চলে গিয়েছিলাম। স্থল এবং নৌবাহিনী যা ব্রিটিশের ভিত্তি ছিল তাদের মনোবল ভেঙে দিয়েছিল এই বাহিনী।" দুঃখের বিষয় এ সত্য আমাদের সামনে আনা হয়নি। সুতরাং সুভাষ অপরাজিত। তাই তার অন্তর্ধান এর ৭৭ বছর পরেও তিনি আপামর বাঙালি এবং ভারতবাসীর হৃদয় কে জয় করে রেখেছেন।

কিন্তু সুভাষ কিভাবে "অপরাজেয়" হয়ে উঠলেন? কাদের সান্নিধ্যে তিনি এই প্রশিক্ষণ পেলেন? কিভাবে একজন পাস করা প্রশাসক, প্রশাসক না হয়ে জননেতা হয়ে উঠলেন? দেশনায়ক হয়ে উঠলেন ? তার ইতিহাস জানাটা জরুরী। সুভাষ থেকে নেতাজি বা দেশনায়ক হয়ে ওঠার নেপথ্যে যাঁরা, তাঁদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা খুব প্রয়োজন আছে। কারণ মানসিক গঠনের ওপর ব্যক্তির কর্ম নির্ভর করে- এই রহস্যটাই আমরা ধরবার চেষ্টা করেছি।

বিভিন্নভাবে তাঁর এই ১২৫ তম জন্মদিবস কে স্মরণ করার, মনন করার উদ্যোগ সরকারি এবং বেসরকারি ভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আপাদমস্তক রাজনীতিবিদ হয়েও সুভাষ ছিলেন রাজনীতির ঊর্ধ্বে।

রাজনীতি ছিল মাধ্যম দেশসেরা ছিল উদ্দেশ্য ।এর কারণেই তাঁর প্রাসঙ্গিকতা আজও সমানভাবে রয়েছে। মূল্যবোধহীন রাজনীতির যুগে, দিশাহীন তরুণ এবং ছাত্র সমাজের অনগ্রসরতার যুগে, দেশকে সঠিক দিশা দিতে সুভাষের জীবন সংগ্রাম, তাঁর নেতৃত্ব দানের কৌশল সর্বোপরি সমন্বয়ের ভাবধারা ও দেশসেবা কে পেশায় রূপান্তরিত না করার বিষয়গুলিকে লিখিত আকারে তাঁর জীবনের ঘটনাবলির সমন্বয়ে সর্বসমক্ষে আনা উচিত। আর এ কারণেই আমাদের বিভাগের পত্রিকায় সুভাষের জীবন গঠনে বিবেকানন্দের প্রভাব, তাঁর নেতৃত্ব দানের গুণাবলী, দেশবন্ধুর কাছে তার রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ এবং সর্বোপরি তাঁর স্বপ্নের তরুণদের সম্পর্কে তার বক্তব্যকে সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী বলে আমাদের মনে হয়েছে। এগুলো তাদের মানসিক গঠন এবং চরিত্র গঠনের উপযোগী হবে বলেই এই বিষয়ে নির্বাচন। "এবং সুভাষচন্দ্র" কেবল কতকগুলি বিখ্যাত ভারতের সঙ্গে সুভাষ এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা নয় আসলে সমকালীন সমাজ সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি তরুণদের জীবন গঠনে তার মতামত এবং জীবন দর্শন কে সর্বোপরি জীবনের মূল্য সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আমরা বিশ্লেষণ করেছি। এছাড়াও নিয়মিত বিভাগ, সাম্প্রতিক ইস্যু বিভাগের পাশাপাশি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন বিভাগে আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মাতঙ্গিনী হাজরার ন্যায় আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় দেশপ্রেমিক দের।

****

শ্রদ্ধা

সার্ধশতবর্ষে মাতঙ্গিনী হাজরা

(১৭ই নভেম্বর ১৮৭০ - ২৯ শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২):-

পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক উজ্জ্বল অধ্যায়ঃ

অনন্যা পাল, তৃতীয় সেমিস্টার, সাম্মানিক,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

বাংলার অগ্নিকন্যা

"কোনকালে একা হয়নিকো জয়ী, পুরুষের তরবারী;
প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে, বিজয়ালক্ষী নারী"

~ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম

এমনই একজন বিজয়ালক্ষী নারী হলেন মাতঙ্গিনী হাজরা। মাতঙ্গিনী হাজরা ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী একজন মহান বিপ্লবী নেত্রী যিনি তাঁর অসামান্য দেশপ্রেমের জন্য ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন বলে তাকে 'গান্ধীবুড়ি' নামে ডাকা হত।

তার প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। শুধু এতোটুকুই জানা যায় যে, ১৮৭০ সালের ১৭ নভেম্বর তমলুকের অদূরে হোগলা নামে

একটি ছোট্ট গ্রামে এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে তার জন্ম হয়েছিল। তাঁর বাবার নাম ঠাকুরদাস মাইতি এবং মা ছিলেন ভগবতী মাইতি। দারিদ্র্যের কারণে বাল্যকালে প্রথাগত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তিনি। অতি অল্প বয়সে তার বিয়ে হয়ে গেছিল। তাঁর স্বামী ছিলেন ত্রিলোচন হাজরা। মাত্র ১৮ বছর বয়সেই নিঃসন্তান অবস্থায় তিনি বিধবা হয়েছিলেন।

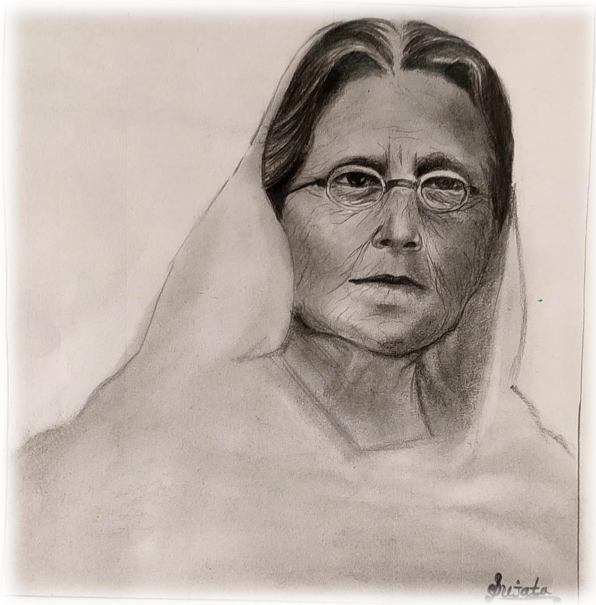

১৯০৫ সালে প্রত্যক্ষভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন তিনি। ১৯৩২ সালে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। সেই সময়ে তিনি লবণ আইন অমান্য করে গ্রেফতার বরণ করেছিলেন। অল্পকাল পরেই অবশ্য তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কর মুকুবের দাবিতে প্রতিবাদ চালিয়ে গেলে আবার তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। এই সময় তিনি বহরমপুরের কারাগারে বন্দিনী ছিলেন। মুক্তিলাভের পর তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য পদ লাভ করেন। ১৯৪২ এর ২৯ শে সেপ্টেম্বর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে উত্তাল মেদিনীপুর। মেদিনীপুর জেলার সকল থানা ও অন্যান্য সরকারি কার্যালয় দখল করে নেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন বিপ্লবীরা। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল জেলা থেকে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করে সেখানে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। মহিলা স্বেচ্ছাসেবক সহ ৬ হাজার সমর্থক তমলুক থানা দখলের উদ্দেশ্যে মিছিল শুরু করে,নেতৃত্বে ছিলেন ৭০ বছর বয়সী মাতঙ্গিনী হাজরা। ১৪৪ ধারা অমান্য করে চলে মিছিল। ফৌজদারি আদালত ভবনের উত্তর দিক থেকে আসছিল মাতঙ্গিনী হাজরার দলটি। পুলিশ তখন গুলি চালাতে শুরু করে। তিনি অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকদের পেছনে রেখে নিজেই এগিয়ে যান। ডান হাতে পতাকা আর বাম হাতে বিজয় শঙ্খ নিয়ে তিনি যেন উল্কার বেগে ছুটে চলেছেন। পুলিশের একটি গুলি হাতে লাগতেই হাতের শঙ্খ পড়ে যায় তাও তিনি এগিয়ে চলেন, মুখে বন্দেমাতরম ধ্বনি। কিছুক্ষণ চলার পর তার ডান হাতে একটি গুলি লাগে তখনও তাঁর ডান হাতে শক্ত করে ধরে রাখা জাতীয় পতাকা। অবশেষে তৃতীয় গুলিটি তার কপালে লাগে তারপরে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। হাতে পতাকা এবং মুখে বন্দেমাতরম ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এই ভাবেই জীবন অবসান ঘটে বাংলার অগ্নিকন্যার।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করলে অসংখ্য স্কুল,পাড়া ও রাস্তার নাম মাতঙ্গিনী হাজরা নামে উৎসর্গ করা হয়। স্বাধীন ভারতে কলকাতা শহরে প্রথম যে নারী মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল সেটি

ছিল মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তি। ১৯৭৭ সালে কলকাতার ময়দানে এটি স্থাপিত হয়।

তমলুকের ঠিক যে জায়গাটিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন সেই জায়গাতে ও তার একটি মূর্তি আছে, ডান হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তি। ২০০২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ভারতের ডাক বিভাগ মাতঙ্গিনী হাজরার ছবি দেওয়া পাঁচ টাকার ডাকটিকিট চালু করে।

দেশবন্ধু: সার্ধশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রী সুপ্রভাত ঘোষ, শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ,
করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

বিগত শতাব্দীর প্রগতিশীল স্বদেশ প্রেমিক বাঙালী তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কান্ডারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ(৫ই নভেম্বর, ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ- ১৬ই জুন, ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ)। যিনি দেশবন্ধু নামে সর্বাধিক পরিচিত। একজন সমাজকর্মী একজন দক্ষ আইনজীবী হলেও তার সর্ববৃহৎ পরিচয় তিনি স্বদেশপ্রেমিক আর এই মহৎ জীবনের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে ধরা রইল তার রাজনৈতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি।

১৯১৭ সালের এপ্রিলে কলকাতার ভবানীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের মাধ্যমে চিত্তরঞ্জন দাশ বাংলার রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা পান। বিশ শতকের বিশের দশকে চিত্তরঞ্জন গান্ধীপন্থী কংগ্রেস আন্দোলনের নেতা হিসেবেই মূলত সুপরিচিত হলেও, তাঁর রাজনৈতিক জীবন কখনই একমাত্রিক ছিল না। তিনি চরমপন্থী ও জাতীয় বিপ্লববাদী রাজনীতির সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠভাবেই যুক্ত ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, জাতীয় স্বাতন্ত্র্যকে মর্যাদা ও সম্মান দিতে হবে।

মতাদর্শের মূল অনুপ্রেরণা:

চরমপন্থীর উদ্ভব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে প্রায় সব ঐতিহাসিকই এই আন্দোলনের অনুপ্রেরণা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী বিবেকানন্দের মতাদর্শ ও রচনার প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। চিত্তরঞ্জনের জীবন আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা তাঁর জীবন ও সাহিত্যে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। চিত্তরঞ্জন দাশ ১২২১ বঙ্গাব্দে নিজ পত্রিকা 'নারায়ণের' মাধ্যমে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন ধর্মেরই প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। এই নারায়ণের মাধ্যমেই তিনি চরমপন্থী ভাবগত দর্শন প্রচার করেছিলেন। চরমপন্থীদের মত জাতীয় আন্দোলনকে তিনি আধ্যাত্মিক চেতনার অংশ হিসাবে মনে করেছিলেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও জাতীয় শিক্ষা নীতিতে:

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর লর্ড কার্জনের পরিকল্পনা মত বঙ্গবিভাগ হলে বাংলার আপামর

জনসাধারণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। সেই সময় চিত্তরঞ্জন দার্জিলিংয়ে একটি জনসভায় বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে তীব্র ভাবে বলেছিলেন যে, বাঙালিরা এতদিন ইংরেজদের দ্বারা শুধুমাত্র প্রতারিত হয়েছে। বাংলা বিরোধী আন্দোলনের সময় কার্লাইল সার্কুলার জারি প্রতিবাদে সরকারি শিক্ষার বিকল্প হিসাবে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন শুরু হয়। এই শিক্ষা আন্দোলনে সুবোধচন্দ্র মল্লিক, ব্রজকিশোর আচার্য চৌধুরী প্রভৃতিদের সঙ্গে চিত্তরঞ্জন দাশও অংশ নিয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছিলেন কেন একটি পৃথক শিক্ষানীতি গ্রহণ করা দরকার। জাতীয় স্কুল স্থাপনের সার্থকতা কোথায় এবং কীভাবে এই স্বপ্নকে সফল করতে হবে তা তিনি সমাজের সর্বপ্রকার মানুষের সামনে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯০৬ সালে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের নেতৃত্বে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে বরোদা রাজ কলেজের বেশি মাইনের চাকরি ছেড়ে অরবিন্দ ঘোষ জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করে বাংলায় এলে তাঁর প্রধান লাভ ছিল অনুশীলন সমিতিকে একটি বিপ্লববাদী দল হিসাবে গড়ে তোলা।

বিপ্লবীদের মুক্তিদানে অবদান:

১৯০৬ সালে সুবোধচন্দ্র মল্লিক, চিত্তরঞ্জন দাশ ও রজতনাথ রায়ের অর্থ সাহায্যে 'বন্দেমাতরম' কাগজ প্রকাশিত হয়। ১৯০৭ সালের ২৭শে জুন সংখ্যায় 'পলিটিক্স ফর ইন্ডিয়ানস' এবং ২৮শে জুলাই যুগান্তর কেস সংক্রান্ত প্রবন্ধ লিখবার জন্য সরকার পত্রিকার সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষকে

গ্রেফতার করেছিল। এই মামলায় চিত্তরঞ্জন দাশ অরবিন্দ ঘোষকে খালাস করেছিলেন। যদিও পত্রিকার প্রধান উদ্যোক্তা বিপিনচন্দ্র পালকে আদালত অবমাননার দায়ে ছয়মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হলে তিনি তাঁর (বিপিনচন্দ্র পাল) সংসারের সমস্ত দায়িত্বভার নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। এর পরই বিখ্যাত মানিকতলা বোমা মামলায় অরবিন্দ ঘোষ ও তার ভাই বারীন্দ্রসহ অনেককে ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেপ্তার করে। চিত্তরঞ্জনের কন্যা অপর্ণা দেবী এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, নামমাত্র পারিশ্রমিকে চিত্তরঞ্জন শুধুমাত্র দেশমাতৃকার প্রতি কর্তব্যবোধে এই মামলায় অংশগ্রহণ করেন এবং আরবিন্দকে নির্দোষ প্রমাণ করেন। বহু প্রতীক্ষার চিত্তরঞ্জনের প্রচেষ্টায় ১৯০৯ সালের ৫ই মে অরবিন্দ ঘোষ মুক্তি পেলেন। এরপর পূর্ববঙ্গে অনুশীলন সমিতির প্রধান কর্ণধার পুলিনবিহারী দাস সহ অন্যান্য ৪৪ জন বিপ্লবী ১৯১০ সালে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে পড়লে চিত্তরঞ্জন

দাস তাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। পুলিনবিহারী অবশ্য এই মামলায় মুক্তি লাভ করেন নি।

গান্ধীপন্থী আন্দোলনে যোগদান:

১৯১৪-১৫ সাল নাগাদ চিত্তরঞ্জন দাশ তিলকের নেতৃত্বে হোমরুল আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন এবং বাংলায় এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন তিনি। ১৯১৭ সালে হোমরুল আন্দোলনের নেত্রী অ্যানি বেসান্তকে কংগ্রেস সভানেত্রী করতে চাইলে চিত্তরঞ্জনের সাথে চরমপন্থীদের বিভেদ আবার বৃদ্ধি পায়। ইতিমধ্যে রাওলাট অ্যাক্ট, জালিয়ানওয়ালাবাগ এবং সত্যাগ্রহকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে যে গণআন্দোলন শুরু হয়েছিল তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকলেও চিত্তরঞ্জন বুঝেছিলেন যে, চরমপন্থীরা যা পারেনি, গান্ধী তা পেরেছিলেন। চিত্তরঞ্জন তাই কৌশলগত কারণেই গান্ধীপন্থী আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু তখনও চরমপন্থী ও জাতীয় বিপ্লববাদীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এমনকি তিনি যখন স্বরাজ্য দলের কান্ডারী হয়ে সাংবিধানিক রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করেছেন তখনও তার সাহিত্যিক সহযোগী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তিনি বিপ্লবীদের সম্বন্ধে দুর্বলতা ও কোমলতা প্রকাশ করেছেন। জেলেবন্দি বিপ্লবীদের মুক্তি দানের জন্য ১৯২৪ সালের ২৩শে জানুয়ারি বাংলার ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশনেই স্বরাজ্য দল বন্দীদের মুক্তি দানের প্রস্তাব তোলে। ১৯২৪ সালের মে মাসে বাংলা প্রাদেশিক কংগেসে সিরাজগঞ্জ সম্মলনে কুখ্যাত ‘ডে’ সাহেবের হত্যা প্রচেষ্টায় জড়িত গোপীমোহন সাহার ফাঁসিতে আত্ম বলিদানের প্রশংসা করে চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে একটি প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। সেই বছর সর্বভারতীয় কংগ্রেসে এই বিষয়টি নিয়ে গান্ধীজির বিরুদ্ধাচারণে পিছুপা হননি।

স্বরাজ্য দলের কর্মসূচী:

১৯২২ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে দেশবন্ধুর সঙ্গে কংগ্রেসের নেতাদের মতভেদ দেখা দেয়। তিনি ‘স্বারাজ পার্টি’ নামে একটি নতুন দল গঠন করলেন। স্বরাজ্য দলের অনেক নেতৃত্ব সদস্যরাই বিপ্লববাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এমনকি চিত্তরঞ্জনের সাহায্য সুভাষচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রচন্দ্রের মাধ্যমে জার্মানি থেকে বিপ্লবীদের অস্ত্র পাওয়ারও একটি চেষ্টা সেই সময় হয়েছিল। ১৯২৪ সালে ২৪শে অক্টোবর বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের দ্বারা অনেক বিপ্লববাদীদের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের ঘনিষ্ট অনুগামী সুভাসচন্দ্র বসু, অনিলবরণ রায় ও সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্রকে বিনা বিচারে আটক করা হলে চিত্তরঞ্জন এদের কাজের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে টেনে নিয়েছিলেন। এমনকি জীবনের শেষ বেলায় ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার কথা বলে তিনি সমালোচিত হলেও সেই বক্তৃতাই চিত্তরঞ্জন বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যের সততা ও স্বদেশ প্রেমের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। এই সম্মেলনের পরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৯২৫ সালে দার্জিলিংয়ে তার দেহাবসান ঘটে।

মূল্যায়ন:

এই আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা চিত্তরঞ্জন দাশের জীবনের বিভিন্ন পর্বে চরমপন্থী রাজনীতির বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। যদিও

তিনি জীবনের বিভিন্নপর্বে স্বায়ওশাসন, অহিংস আন্দোলনের পক্ষপাতি হলেও তাঁর সমস্ত রাজনৈতিক কাজের প্রাথমিক পর্বে চরমপন্থী রাজনীতির একটা ছাপ থেকে গিয়েছিল। বর্তমান সাম্প্রদায়িক রাজনীতির যে বিষবাষ্প আমাদের সামনে নতুন ধরনের সংকট নিয়ে এসেছে, আজকের বাস্তবতা অনুযায়ী তার মোকাবেলা করা দরকার। সেই কাজে চিত্তরঞ্জন দাশের চিন্তা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আমাদের অনুপ্রেরণা হতে পারে।

সার্ধশতবর্ষে রোজা লুক্সেমবার্গঃ এক অনন্য সমাজবাদী নেত্রী

বর্ষা খাতুন, পঞ্চম সেমিস্টার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
সাম্মানিক, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

প্রারম্ভিক জীবন ও প্রতিবন্ধকতাঃ

বিশ্ব সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন রোজা লুক্সেমবার্গ।তিনি ছিলেন একজন জ্বলন্ত বিপ্লবী নারী।তিনি তাঁর জীবনের শুরু থেকেই প্রথাগত বাধা ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিলেন।তিনি সেই বাধা গুলি কে পাত্তা না দেওয়ার কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি ১৮৭০(অনেক এর মতে ১৮৭১)সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রুশ দখল থাকা পোল্যান্ডের একটি ইহুদি পরিবারে। এই বছর তাঁর জন্মের সার্ধশতবর্ষ পূর্ণ হবে। একেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন নারী হিসেবে, তার ওপর আবার কিছু শারীরিক প্রতিবন্ধকতাও ছিল।সংগ্রাম মুখরিত বৈপ্লবিক জীবন ছিল রোজা লুক্সেমবার্গের।মাত্র ১৫ বছর বয়সে তৎকালীন আত্মগোপনকারী- নিষিদ্ধ-বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দলে যুক্ত হন তিনি,মাত্র তিন বছরের মধ্যেই নজর কাড়েন। তিনি দেখিয়েছিলেন সমাজ পরিবর্তনে যুক্ত হবার জন্য কোন বয়স লাগে না।

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশীদারঃ

এই মহান বিপ্লবী সম্পর্কে ১৯২২ সালে লেলিনের সেই অবিস্মরণীয় উক্তি যার মূল কথা ছিল এইরকম; বেশ কিছু বিষয়ে লুক্সেমবার্গের অবস্থানে ভুলভ্রান্তি থাকলেও তিনি ছিলেন এবং থাকবেন আকাশে ওড়া ঈগল পাখির মত।

১৮৯৪ সালে তিনি লিউ জগিসেস এর সাথে একত্রে পোল্যান্ড রাজ্যে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ দল গঠন করেন। ১৮৯৮ সালে তিনি সেখানে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ দলে যোগদান করেন এবং শীঘ্রই

ইউরোপের একজন তাত্ত্বিক রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর আকস্মিক খ্যাতির মূলে হলো জার্মান সংশোধনবাদী নেতা বার্নস্টাইন এর তত্ত্বের তীব্র সমালোচনা করে লিখিত সামাজিক সংস্কার অথবা বিপ্লব (Social Reform or Revolution) শীর্ষক পুস্তকটি।এই পুস্তকটিতে তিনি বার্নস্টাইনের সামাজিক-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তীব্র সমালোচনা করে মাক্স মার্কসীয় তত্ত্ব কে অক্ষুন্ন রাখতে প্রয়াসী হন।তিনি বলেছিলেন আমি ধনীদের চেতনা ভারাক্রান্ত করে দেব ভোগান্তি আর গোপন, তিক্ত ব্যথার অশ্রু দিয়ে।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক-এর প্রায় প্রতিটি কংগ্রেস উপস্থিত থেকে তিনি মার্কসবাদের বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে সচেষ্ট হন।

লেলিনের সঙ্গে বিতর্ক:

১৯০৪ সালের রুশ গণতান্ত্রিক সমাজবাদী দলের সাংগঠনিক প্রশ্ন(Organization Questions of Russian Social Democracy)শীর্ষক গ্রন্থে তিনি লেলিন বর্ণিত সাংগঠনিক নীতির তীব্র বিরোধিতা করে বলেন যে লেলিনের নীতিতে দল গঠিত হলে তা শ্রমিকশ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাল মার্কসের শ্রেণী সচেতনতা তত্ত্বের অবলম্বনে রোজা শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে শ্রেণীর সচেতনতায় বিশ্বাসী ছিলেন।তিনি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন। আর সেই জন্য তিনি মানুষকে তার নিজেদের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছেন বারবার। রোজা লুক্সেমবার্গ এর জন্মের সার্ধশতবর্ষ এক রকমই একটি সুযোগ করে দিয়েছে তার চিন্তা-ভাবনা প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরার।কিন্তু তার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি আলোচনায় যথেষ্ট জটিল ও স্পর্শকাতর। কারণ মার্কসবাদী মহলের একটি বড় অংশ আজ রোজা লুক্সেমবার্গ এর চিন্তাকে মান্যতা দিতে নারাজ,অনেকের চোখে তিনি যথার্থ মার্কসবাদী নন। তা সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শীর্ষ বুদ্ধিজীবী ও বিপ্লবী বলে বিবেচিত হন।

প্রাসঙ্গিকতা:

সোভিয়েত উত্তর দুনিয়ায় রোজা লুক্সেমবার্গ সম্পর্কে যে নতুন গবেষণা ও পুনর্মূল্যায়ন গত কয়েক দশক থেকে জারি রয়েছে তা বলাবাহুল্য,তাঁর দশাটি অতীতের দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।যে বিপুল তথ্য এখন রোজা গবেষকদের সামনে উপস্থিত হয়েছে তার ভিত্তিতে বর্তমান সময়ে,বামপন্থা ও মার্কসবাদের সংকট কালে রোজা লুক্সেমবার্গ এর চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।লেলিন বলেছিলেন পৃথিবীর সব কমিউনিস্টদের স্মৃতিতে তিনি বিরাজ করবেন। তাঁর জীবন ও সমগ্র রচনাবলী বহু প্রজন্মের কমিউনিস্টদের প্রশিক্ষিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

রোজা লুক্সেমবার্গের সেই অবিস্মরণীয় উক্তি যে সমাজতন্ত্র যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তার বিকল্প হবে বর্বরতা। আজকের পৃথিবীতে শ্রমজীবী মানুষের কাছে এর চেয়ে বড় সত্য বোধহয় আর কিছু নেই। সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের যে কোনো বিকল্প নেই, প্রতিনিয়ত খেটে খাওয়া মানুষ সেটা অনুভব করেছেন তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে। সেই সমাজতন্ত্রের মূল চালিকাশক্তি হবে শ্রমজীবী মানুষ এবং তাঁরা তখনই গড়ে তুলতে পারবেন যথার্থ

সমাজতন্ত্র যখন তারা হবেন বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক স্তরে সমৃদ্ধ। সমাজতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তিটি হবে গণতন্ত্র। কিন্তু সেই গণতন্ত্র হবে বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত বুর্জোয়া লিবারেল গণতন্ত্র নয়,যেখানে ধ্বনিত হবে শ্রমজীবী মানুষের কণ্ঠস্বর।

বিশেষত সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে রোজা লুক্সেমবার্গ এর মত অগ্রনি নারী নেতৃত্ব খুব একটা দেখা যায়নি।বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে ও তাত্ত্বিক ময়দানে তিনি ছিলেন একজন অগ্রসেনানী। ইউরোপীয় দেশগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে এবং সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার নিরিখে তিনি হলেন যথার্থ বিপ্লবের প্রতিচ্ছবি। জীবনের চার দশকের কিছু বেশি আয়ুষ্কালের মধ্যেই মহৎ কর্ম ও সাহসী আত্মত্যাগের মাধ্যমে তিনি বিপ্লবী নারীর প্রতিকৃতি হয়ে নিজের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন ইতিহাসের অম্লান পাতায়। তাঁর এই জন্মের সার্ধশতবর্ষে আমি একজন সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্রী হিসেবে তাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

সাম্প্রতিক ইস্যু

এক ঐতিহাসিক সত্যাগ্রহঃ কৃষি আইন প্রত্যাহারের নেপথ্যে

রিঙ্কি বিশ্বাস, স্টেট এডেড কলেজ টিচার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

"আমি দেশের মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে মন থেকে এবং পবিত্র হৃদয় থেকে বলতে চাই, হয়তো আমার তপস্যার মধ্যে কোন ঘাটতি ছিল তাই আমি কিছু কৃষককে বোঝাতে পারিনি"- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঠিক এই বক্তব্যের মাধ্যমে বিতর্কিত তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহারের ঘোষণা করেন, খুব কৌশলগত ভাবে গুরু পরবের দিন। তিনি জানান নিয়ম মেনে শীতকালীন অধিবেশনে বিল পেশ করে, কৃষি আইন প্রত্যাহার করা হবে। তার এই বক্তব্য আপাতত ভাবে 'তার রাজনৈতিক স্বভাববিরুদ্ধ'

ভারতীয় কৃষি আইন ২০২০:

বিতর্কিত তিনটি কৃষি আইন কুড়ি সালের সেপ্টেম্বরে শুরু হয়েছিল ।লোকসভায় ২০২০ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর এবং রাজ্যসভায় ২০২০ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর ভারতের রাষ্ট্রপতি বিল গুলিকে অনুমোদিত করেছিল। রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ২০২০ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর এই তিনটি কৃষি আইনকে সম্মতি দিয়েছেন। এই ৩ টি কৃষি আইনের প্রথম টি হল-

1. **অত্যাবশ্যক পণ্য (সংশোধনী):** বড় বেসরকারি সংস্থা গুলি সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে পণ্য কিনে বিক্রি ও মজুত করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে কৃষকদের আশঙ্কা বেসরকারি সংস্থা গুলি লাগামছাড়া মজুতদারির মাধ্যমে কৃত্তিম সংকট তৈরি করবে এবং দেশের মানুষের স্বার্থ না দেখে কৃষিপণ্যের রপ্তানি করবে।

2. **কৃষিপণ্য লেনদেন ও বাণিজ্য উন্নয়ন:** দ্বিতীয়য কৃষি আইন অনুযায়ী কৃষকরা মান্ডির বাইরে যে কোন বাণিজ্যিক সংস্থা কে তাদের ফসল বিক্রি করতে পারবেন ,এক্ষেত্রে কৃষকদের আশঙ্কা কৃষকরা এ আইনের ফলে তাদের ফসলের ন্যায্য মূল্য পাবেননা ।বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা গুলি কৃষকদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করবে।

3. **কৃষক সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন (মূল্য ও পরিষেবা):** তৃতীয় আইন অনুযায়ী কৃষকরা চুক্তিনির্ভর চাষ করতে পারবে অর্থাৎ চাষের আগে বড় সংস্থার কাছে চুক্তির মাধ্যমে শষ্যের মূল্য নির্ণয় করতে পারবে কিন্তু এই সংস্থাগুলি কৃষকদের সাথে করা চুক্তির খেলাপ করলে সংস্থার বিরুদ্ধে আইনি মোকাবেলা করা কৃষকদের পক্ষে কার্যত অসম্ভব।

কৃষকদের দাবিঃ

২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বির্তকিত ৩ কৃষি আইন সংসদে পাশ হওয়ার পর থেকে কৃষকদের মনে নানান আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। দেশের কৃষকদের একটি বৃহত্তর অংশ এই এই তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবি জানায়। পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার ইউনিয়ন গুলির ধারণা কেন্দ্র প্রণীত আইন গুলি ন্যূনতম ব্যবস্থা বা মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস (MSP) ভেঙ্গে দেবে। যা কৃষকদের ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং বেসরকারি সংস্থাগুলো গুলিকে ফুলে-ফেঁপে উঠতে প্রয়োজনীয় রসদ এর যোগান দেবে। কৃষকদের আশঙ্কা এই আইনের ফলে মান্ডি ব্যবস্থার কার্যকারিতা হ্রাস পাবে, যার ফলে কৃষকরা তাদের ফসলের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হবে। কৃষি আইনের এই নেতিবাচক দিকগুলির জন্য কৃষকরা এই আইন তিনটিকে প্রত্যাহারের দাবি জানায় । সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শে কেন্দ্র ও কৃষকদের মধ্যে কয়েক দফা বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়, যাতে সমাধান সূত্র পাওয়া যায় কিন্তু এর সুফল পাওয়া যায়নি।

কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন:

বির্তকিত তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে কৃষকরা আন্দোলন শুরু করে দিল্লির সিংঘু সীমান্তে। দিল্লির সীমান্তে কৃষক আন্দোলন সূচনা থেকে কেন্দ্র সরকার ছলে-বলে-কৌশলে কৃষক আন্দোলন ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে। কৃষকরা দিল্লির সীমান্তে মাসের-পর-মাস বহু প্রতিকূলতার মধ্যে প্রচন্ড শীত ও তীব্র গ্রীষ্ম সহ্য করেও তাদের অবস্থান চালিয়ে গেছেন ।এই প্রতিবাদী কৃষকদের ওপর বারবার নেমে এসেছে রাষ্ট্রের ক্রোধ, হতে হয়েছে তাদের বিভিন্ন অপবাদ ও কুৎসার শিকার। আন্দোলনরত কৃষকদের কেন্দ্রসরকার কখনো খালিস্তানি কখনো মাওবাদী ও কখনও দেশদ্রোহী বলে কালিমালিপ্ত করতে চেয়েছে। রাষ্ট্রশক্তির নির্মম অত্যাচারের কারনে এক বছরে প্রায় ৭০০ জন কৃষকের প্রাণপাত হয়েছে কিন্তু তাতেও আন্দোলন ভাঙ্গেনি বরং তার পরিধি ক্রমশ সম্প্রসারিত হয়েছে ।কৃষকেরা আরো বেশি বেশি সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে এবং নিজেদের

শক্তিশালী করে তুলেছে। আধিপত্যবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কৃষকদের স্পর্ধা দেশ থেকে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। কৃষকেরা বিদেশের মাটিতেও অভিবাদন অর্জন করেছে ,তাদের আন্দোলনের আত্মশক্তির নিরিখে।

বিতর্কিত তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার: দিল্লিতে ৩৫৮ দিনের আন্দোলনের পর ২০২১ সালের গুরু পরবের দিন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। রাষ্ট্রশক্তি অদম্য আত্মশক্তি ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর সত্যাগ্রহী কৃষকদের কাছে মাথা নত করেছে।কৃষকরা দেখিয়েছে দীর্ঘদিন ধরে সংগঠিত ও অহিংস প্রতিবাদী আন্দোলন কিভাবে আধিপত্যবাদী রাষ্ট্রকে পিছু হটতে বাধ্য করে ।দেশে বেশকিছু স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জেএনইউ, জামিয়া মিলিয়া, যাদবপুর থেকে শুরু করে শাহীনবাগের আন্দোলন চত্বর বা পার্কসার্কাসের জনপরিসরে বারবার শোনা যায় 'হাম দেখেঙ্গে'-। এটা কোন ক্ষমতার আস্ফালন নয়, এটা হল ন্যায্য দাবির অঙ্গীকার ,এটাই হলো সত্যাগ্রহ প্রতিবাদ- যার কাছে মোদি সরকার মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে। কৃষি আইন বাতিলের পর দেশজুড়ে 'জয় কিষান' আওয়াজ ওঠে। কৃষকরা দেশের ভরসা, তারা সাধারণ মানুষের ভরসারযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে।

ভোট বড় বালাই: বিতর্কিত তিনটি কৃষিঋণের প্রত্যাহারের পর, দেশের রাজনীতি সরগরম ঠিক কি কারণে প্রধানমন্ত্রীর এমন সিদ্ধান্ত তবে কি ভোট সেই কারণ যা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মতো ক্ষমতাশালী ব্যক্তি কে তার 'রাজনৈতিক স্বভাব বিরুদ্ধআচরণে 'বাধ্য করেছে রাজনৈতিক স্বভাববিরুদ্ধ আচরণ বলতে মোদি সরকারের ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি কে বোঝানো হয়েছে, যা তিনি ৭ বছরের শাসনকালে মাত্র দুইবার করেছেন। পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের মুখে উপনির্বাচনের ধাক্কা প্রধানমন্ত্রীকে পিছু হটতে বাধ্য করেছে এ নিয়ে সন্দেহ নেই। তিনটি কৃষি আইন বাতিলের পর এখন ভোট মুখী পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের রাজনৈতিক শক্তির বিন্যাস কী হবে তা নিয়ে কাটাছেঁড়া চলছে। গুরু পরবের দিন কৃষি আইন প্রত্যাহার করে মোদি সরকার কি শিখ আবেগকে স্পর্শ করতে পারবে? উত্তরপ্রদেশের জাঠ কৃষকেরা কি তার এই সিদ্ধান্তে প্রভাবিত হবে? লাখিমপুর এর ভয়াবহ ঘটনা যে গভীর ক্ষত তৈরি করেছে তাতে কি মোদি সরকারের সিদ্ধান্ত প্রলেপ দিতে পারবে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় ভোট হল সেই জুজু যার ভয়ে এই শক্তিশালী মোদি সরকারের এমন 'রাজনৈতিক স্বভাববিরুদ্ধ' আচরনে সাক্ষী থাকলো গোটা দেশ। সত্যাগ্রহ কথাটি এসেছে সত্য এবং আগ্রহ এই দুটি শব্দের মেলবন্ধনে যার অর্থ হলো সত্যের জন্য অহিংস আন্দোলনের পথে প্রতিবাদ করা । বিতর্কিত তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে কৃষকদের অহিংস আন্দোলন ছিল একপ্রকার সত্যাগ্রহ আন্দোলন। কৃষকদের এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন জারি রাখার সামর্থ্যই তাদের লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছে, এই সামর্থ্যই দেশের গণতন্ত্রকে আরো দৃঢ় করবে এই আশা রাখা যায়।

****

আফগানিস্তানে তালিবানি শাসন, ২০২১: নয়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে

শ্রী মৃণাল সিংহ বাবু, স্টেট এডেড কলেজ টিচার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

দক্ষিণ-এশীয় রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে যে ভূ রাজনৈতিক কৌশল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বারবার পরিবর্তনে সাহায্য করেছে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো আফগানিস্তানে তালিবানি শাসন। গত ১৫ ই আগস্ট ২০২১ ভারতের ৭৪ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন সময়ে ভারতের অন্যতম সহযোগী প্রতিবেশী রাষ্ট্র আফগানিস্থানে ইসলামিক রিপাবলিক অফ আফগানিস্তান নামকরণ থেকে ইসলামিক আমিরাত অফ আফগানিস্তানে এ পরিবর্তন হয় তালিবানি শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে। আফগানিস্থানে এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাবে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রগুলির ভূ রাজনৈতিক(Geo-political) কৌশলও পরিবর্তিত হয়। আফগানিস্তানের দক্ষিণ ও পূর্ব দিকের সংখ্যাগরিষ্ঠ পুস্তন জাতিগোষ্ঠীর ইসলামীয় শরীয় আইন বা ইসলামী আইন আফগানিস্থানে প্রতিষ্ঠার অদম্য ইচ্ছা ও বৈদেশিক মতাদর্শগত সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে তালিবানি সনাতনী ইসলামিক স্কুলের শিক্ষিত ছাত্রদের নিয়ে যে আন্দোলন দীর্ঘকাল ধরে পরিচালিত হয়েছিল তার পরিপূর্ণতা লাভ করে ২০২১ সালে তালিবানি শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

ইতিহাসের আলোকে তালিবান:-

১৯৭৩ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানে মোহাম্মদ জাহির শাহ রাজতন্ত্রের পতন ঘটে এবং প্রজাতন্ত্র হিসেবে আফগানিস্তানের আবির্ভাব ঘটে। ১৯৭৮ সালে আরেকটি অভ্যুত্থানে নিষিদ্ধ বামপন্থী দল পিপল্‌স ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ আফগানিস্তান (পিডিপিএ) ক্ষমতায় আসে। এই দলের সাম্যবাদী শাসন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে আফগানিস্তানের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করে। তবে ইসলামী বিদ্রোহী মুজাহেদিনেরা এই শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করে।পিডিপিএ-কে সমর্থন করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে আফগানিস্তানে একটি পূর্ণমাপের আক্রমণ পরিচালনা করে। এই আক্রমণের পরে একজন মধ্যপন্থী পিডিপিএ নেতাকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়, যাতে মুজাহেদিনেরা শান্ত হয়। কিন্তু মুজাহেদিনেরা সোভিয়ত অধিকৃতির বিরুদ্ধে গেরিলা হামলা অব্যাহত রাখে। পিডিপিএ সরকার সোভিয়েত সরকারের কাছ থেকে আর্থিক ও সামরিক সহায়তা পেত, অন্যদিকে মুজাহেদিনেরা যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান, সৌদী আরব ও অন্যান্য মুসলিম দেশ থেকে সাহায্য পেত। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত সেনা প্রত্যাহারের পর আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। মুজাহেদিনরা পিডিপিএ সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ জোরদার করে। অবশেষে ১৯৯২ সালে সরকারের পতন ঘটে, কিন্তু মুজাহেদিনদের ভিতরের দলীয় কোন্দলের কারণে গৃহযুদ্ধ শেষ হয়নি। একদল মুজাহেদিন

তালেবান নামের একটি ইসলামী মৌলবাদী দল গঠন করে ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বরে মোল্লা মোহাম্মদ ওমর ৫০ জন মাদ্রাসার ছাত্রদের নিয়ে তালিবানি গোষ্ঠী তৈরি করে। এই তালিবানীদের লক্ষ্য ছিল আফগানিস্থানে ইসলামী আইন শরিয়া প্রতিষ্ঠা ও মতাদর্শ ছিল দেওবন্দী ইসলাম, ইসলামিক মৌলবাদ, জিহাদ, পুস্তনসম্প্রদায়বাদ। এইসময় কিছুদিনের মধ্যেই কান্দাহার শহর ও আফগানিস্তানের ১২টি প্রদেশে দখল করে নেয়। ১৯৯৬ সালে কাবুল দখল করে। কিন্তু তালিবানিদের ভীতিমূলক কার্যকলাপ আফগানিস্তান জনগোষ্ঠীর মধ্যে ও বৈদেশিক রাষ্ট্রদের কাছে আতঙ্কজনক হয়ে ওঠে। ২০০১ সালে ১১ই সেপ্টেম্বর তালিবানের জেহাদী গোষ্ঠী আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেন এর নেতৃত্বে আমেরিকার পেন্টাগন ধ্বংস করায় সোভিয়েত কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তালিবানিদের উদ্ভবে সাহায্য করেছিল সেই যুক্তরাষ্ট্র তালিবানি ধ্বংসে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সহায়তায় নর্দান অ্যালায়েন্স তালিবানদের পতন ঘটায়। মার্কিন তত্ত্বাবধানে ২০০৪ সালে একটি নতুন সংবিধান পাশ করে। নতুন সংবিধান অনুযায়ী আফগানিস্তানে প্রেসিডেন্ট-শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আফগানিস্তানে মার্কিন নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করা সেনা প্রত্যাহার এবং আফগানিস্তানের ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তালিবানরা ও তার সঙ্গে যুক্ত আল কায়েদা, হক্কানী নেটওয়ার্ক জঙ্গীগোষ্ঠী বিভিন্ন নাশকতামূলক সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপ চালিয়ে যায়।

আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ২০২০ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে কাতারের দোহাতে যুক্তরাষ্ট্র ও তালিবান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ও পরে আফগান সরকার ও তালিবানের মধ্যে আলোচনা হয়। ২০২১ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি পদে নিযুক্ত হলে আফগানিস্তানে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেন। জুলাই এ মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের সময়ে তালিবানিরা ক্রমশ অগ্রসর হয়ে ৪৩১ টি জেলা দখল করে ও পরে কাবুল দিকে অগ্রসর হলে তৎকালীন আফগান রাষ্ট্রপতি পর আশরাফুল গণি সংযুক্ত আরব আমিরাত আফগানিস্তান পালিয়ে যায়। আমরুল্লাহ সালেহ, আহমদ মাসুদ পঞ্জশিরে তালিবানি প্রতিরোধ গড়ে তুললেও ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ১৫ই আগস্ট ২০২১ অন্তর্বর্তী তালিবানি শাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রী হন মোল্লাহ মোঃ হাসান আখুন্দ।

২০২১ তালিবানি শাসনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া:-

আফগানিস্থানে তালিবানি শাসন প্রতিষ্ঠার লড়াই ও প্রতিষ্ঠার পর আফগানিস্তানের অভ্যন্তর এবং বাহ্যিক রাষ্ট্রগুলির প্রভাব প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।

ক) ভূ-রাজনৈতিক কৌশল ও আন্তর্জাতিক আধিপত্যের পরিবর্তন: এই তালিবানি সমস্যা দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক কৌশল ও সম্পর্কে নতুন মাত্রা তৈরি হয়। ২০০১ সাল থেকে আফগানিস্তানের তালিবানি ও মার্কিন সম্পর্কে ছেদ তৈরি হয়। ঠান্ডা যুদ্ধের শেষ পর্যায় ও ঠান্ডা যুদ্ধোত্তর দীর্ঘ দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন আধিপত্য ভিত্তিক ব্যবস্থা শিথিল হতে থাকে পরবর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সেনা ফেরত আনার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনের ঘোষণা মার্কিন ক্ষমতা বিষয়ে প্রশ্ন প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়। অন্যদিকে আফগানিস্থানে সোভিয়েত আধিপত্য অনেক আগেই হারিয়ে ফেলে। আফগানিস্তান ও

ভারত সুসম্পর্কের বিরতি ঘটে। ধর্মীয় দিক থেকে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রভৃতি দেশ সমর্থন ও স্বীকৃতি জানায়। গণপ্রজাতন্ত্রী চীন আফগানিস্তানে তালিবানি শাসন প্রতিষ্ঠা কে সমর্থন জানিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের নতুন আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ) মানবিক নিরাপত্তা ও নারীদের স্বাধীনতা বিষয়ে প্রশ্ন: ১৯৯৬ সালে আফগানিস্তানে তালিবানি শাসনের নির্মম অভিজ্ঞতা থেকে ২০২১ সালে তালিবানি শাসন প্রতিষ্ঠা নতুন করে বিভিন্ন উদ্বাস্তু, অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর, প্রবাসীদের এবং বিশেষ করে আফগানিস্তানের নারীদের স্বাধীনতা, নিরাপত্তা এবং মানবাধিকার আশঙ্কিত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। সেখানে দশ বছরের বেশি বয়সের মেয়েদের স্কুলে যেতে দেওয়া হতো না। কোনোরকম বাইরের কাজে তাদের অংশ নিতে দেওয়া হতো না। পুরুষ সঙ্গী ছাড়া রাস্তায় বের হতে দেওয়া হতো না। বোর্খা পরা বাধ্যতামূলক ছিল।নারী স্বাধীনতার ক্ষেত্রে চরম থেকে এবার 'নরমপন্থী' পথ ধরল তালিবান জঙ্গিরা। সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে তালিবান মুখপাত্র জানিয়েছে, একলা বাইরে যেতে পারবেন মহিলারা। তবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই হিজাব পরতে হবে তাদের। তালেবান এবারেও জানিয়েছে, শরিয়া আইন মেনেই নারী অধিকারের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। তালেবান মুখপাত্র ঘোষণা করে নারীদের স্বাধীনতা সুরক্ষিত হবে সাময়িকের জন্য কিছু নিয়মাবলী প্রযুক্ত হবে, সরকার গঠিত হলে শরিয়া আইন অনুসারে নারী অধিকার সুরক্ষিত হবে। বাস্তবের আলোকে এখনো পর্যন্ত নারীদের স্কুল-কলেজে, ও কর্মস্থলে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা এবং পুরুষ আত্মীয় সঙ্গ ছাড়া দুধে ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।কিন্তু পশ্চিমী দৃষ্টিকোণ থেকে নাদিরা স্বাধীনতাহীন ও অসুরক্ষিত।তবে অনেকে পূর্বেকার তালিবানি শাসন থেকে বর্তমান শাসন ব্যবস্থা বাস্তবসম্মত বলে সমর্থন জানিয়েছে।

গ) গণতন্ত্রের অস্তিত্বহীনতা: গণতান্ত্রিক দেশগুলোর গণতন্ত্রীকরনের প্রচেষ্টা আফগানিস্তানের কিছু শিক্ষিত জনসম্প্রদায় এর মধ্যে গণতান্ত্রিক বোধ জাগ্রত হয় কিন্তু তাদের ঐতিহ্যগত একনায়কতান্ত্রিক অধীনস্থ মানসিকতার দরুন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা বারবারই বিঘ্নিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে শাসন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। ২০২১ সালের তালিবানি অভ্যুত্থান ও শাসন এক ধরনের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের অস্তিত্বহীনতা তৈরি করে। গণতান্ত্রিক দেশ গুলি যেমন ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত চিন্তিত আফগানিস্তানে তালিবানি শাসন প্রতিষ্ঠা কে নিয়ে।

ঘ) সভ্যতার সংঘাত: ২০২১ সালে আফগানিস্তানে তালিবানি শাসন প্রতিষ্ঠা স্যামুয়েল হান্টিংটনের Clash of Civilization গ্রন্থের খ্রিস্টীয় ও ইসলামিক মৌলবাদের সংঘাত ধারণা নতুন করে প্রমাণ করে। মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামী আইন ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও প্যান ইসলামীকরণ প্রচেষ্টা মূলত খ্রিস্টীয় মতাদর্শ থেকে মুক্ত হয়ে ইসলাম পুনরুজ্জীবন এর মাধ্যমে যে এক ধরনের মৌলবাদীকরণ দেখা যায় তা মূলত খ্রিস্টীয় মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। আফগানিস্থানে প্যান-তালিবানিকরন, প্যান-ইসলামীকরণ দীর্ঘ প্রচেষ্টা

২০২১ সালে তালিবানি শাসন এর মাধ্যমে সাফল্য লাভ করে ও এক ধরনের ইসলামী মেরুকরণ তৈরি সাহায্য করে।

সর্বশেষে বলা যায় ২০২১ সালে আফগানিস্থানে তালিবানি শাসন বিশ্বকে এক নতুন ধরনের বার্তা প্রদান করে ও আন্তর্জাতিক চর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন সংযোজন ঘটে। বিশ্বকে প্রমাণ করতে চায় তালিবানি শাসন জঙ্গিগোষ্ঠী শাসন নয়, এক ধরনের ইসলামিক আইন ভিত্তিক বিদেশি প্রভাবমুক্ত হওয়ার শাসন। এখনো পর্যন্ত আফগানিস্থানে সুগঠিত সরকার প্রতিষ্ঠিত না হলেও আফগানিস্থান কেন্দ্রিক যে দীর্ঘ সমস্যা তা অনেকটাই শান্ত হয়েছে। বিদেশি রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে শান্তিমূলক সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেছে।

গ্লাসগোর পরিবেশ সম্মেলন/COP-26: পাওয়া না পাওয়ার হিসেব

অসম রেজা, পঞ্চম সেমিস্টার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সাম্মানিক, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

সম্মেলন কেন:

প্রায় তিন দশক ধরে জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলনের জন্য পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশকে একত্রিত করে আসছে, যাকে Conference of the Parties বা COP বলা হয়ে থাকে। এই বছর ২৬ তম বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলন হয়। একে COP-26 বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই সময়ে জলবায়ু পরিবর্তন একটি প্রান্তিক সমস্যা থেকে বিশ্বব্যাপী অগ্রাধিকারে চলে গেছে। এই বছর জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় স্কটল্যান্ড এর গ্লাসগো তে, ৩১শে অক্টোবর থেকে ১৩ই নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত। ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ - এর পর্যালোচনার ভিত্তিতে পৃথিবীর ১৯৪টি দেশের শীর্ষ নেতৃত্বরা বসেছেন কে কতটা কি উদ্যোগ নিতে পারেন তা স্থির করার জন্য। হিসেব করে দেখা হচ্ছে কিভাবে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতাকে বেঁধে রাখা যায়। শিল্প বিপ্লবের আগে বায়ুমণ্ডলের যে গড় তাপমাত্রা ছিল, একুশ শতকের শেষে তার থেকে যেন তা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি না বাড়ে। বাড়লে কি হবে, এমনকি ১.৫ডিগ্রিতেই বা কি দুর্দশা

ঘনাবে, তার ভবিষ্যৎবাণী আমরা একাধিক দশকজুড়ে পেয়ে আসছিলাম, এই সংক্রান্ত নানা গবেষণার সূত্রে। মেরুর বরফ গলে যাওয়া, সমুদ্রে জলের উচ্চতা বৃদ্ধি, দ্বীপ রাজ্যগুলোর জলের তলায় তলিয়ে যাওয়া, অতিবৃষ্টি, দৈত্যাকার ঘূর্ণিঝড়, দাবানল, অপকারী পতঙ্গের বাড়বাড়ন্ত, শস্যহানি ইত্যাদি গায়ে কাঁটা দেওয়া সিনেমার বিষয়ে তার প্রতিটিই এর উদাহরণ।

রাষ্ট্রগুলির আশু কর্তব্য:

আজ আর ভবিষ্যৎবাণী জরুরী নয়, আমরা এখনই দাঁড়িয়ে আছি ১.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বর্ধিত তাপমাত্রায়। বিপর্যয় এখন আর আসছে না, এসে গেছে। সাম্প্রতিক আবহাওয়ার গতি প্রকৃতি দেখে, মেরুর ও পর্বত শিখরের বরফ গলার মাত্রা থেকে তা আমরা আশঙ্কা করছি। এবং পৃথিবী অপ্রস্তুত। সম্ভবত ২০৪০ নাগাদই আমরা ১.৫ ডিগ্রির লক্ষণরেখা ছুঁয়ে ফেলবো। এই জলবায়ু সম্মেলন যেন একটা ধেয়ে আসা উল্কার দিকে তাক করা দূরবীন- পরিস্থিতিটাকে এভাবেই দেখতে চান সম্মেলনের প্রতিনিধিগণ।

তাপমাত্রা বাড়ছে। কারণ বাতাসে জমেছে নানারকম গ্রীন হাউস গ্যাস, তাই পৃথিবীর তাপমাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অতীতে পৃথিবীর দিনের তাপ রাতে বিকিরণ করে নিজের তাপমাত্রাকে একটা বিশেষ সীমায় বেঁধে রাখতে পারতো। গ্রিন হাউস গ্যাসের কারণে আর তা পারছে না, ফলে তাপ জমছে ধীরে ধীরে। এই গ্রিন হাউস গ্যাসের উৎপাদনের মধ্যে রয়েছে কয়লা, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস। এবং গাছপালা অতিমাত্রায় ধ্বংস করার মাধ্যমেও গ্রিন হাউস গ্যাসের বাড়বাড়ন্ত।

বাস্তবের হিসেব-নিকেশ:

জলবায়ু সম্মেলন গুলোতে একটা বড় সময় ব্যয় করা হয় কি উপায়ে, কত বেশি হারে, কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাসে মেশা আমরা বন্ধ করতে পারি তা নিয়ে। যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে শিল্পোদ্যোগ ও শক্তি উৎপাদনের, অর্থাৎ সেই সূত্রে এই চিরাচরিত জ্বালানি গুলো পোড়ানোর সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। কাজেই সমস্যাটা গিয়ে দাঁড়ায় কোন দেশ কতদূর নিজের দেশের জনগণের জীবনধারা অপরিবর্তিত রেখে এই সব জ্বালানি ব্যবহার কমাতে পারে বা শক্তি উৎপাদনের বিকল্প উপায় বার করতে পারে। বলা বাহুল্য, দেশের জনগণের কাছে করা উন্নয়নের অঙ্গীকার আর জলবায়ু সম্মেলনে দাঁড়িয়ে নিজের দেশ থেকে বাতাসে গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণের মাত্রা কম করার অঙ্গীকার - এ দুটোকে মেলানো কঠিন।

একটা উপায়, কয়লা- তেল কম পোড়ানো, বা একেবারে পোড়ানো বন্ধ করা, তার বদলে শক্তি উৎপাদনের জন্য পুনর্বায়নযোগ্য বিকল্প গুলোর দিকে এগোনো। যেমন- সৌরশক্তি ও বায়ুশক্তি, ছোট ছোট জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ইত্যাদি আরো কিছু বিকল্পের কথা ভাবা চলে। পুনর্বায়নযোগ্য নয় , কিন্তু বাতাসে গ্রীন হাউস গ্যাস কম মেশে এমন কিছু বিকল্পের মধ্যে আছে পরমাণু শক্তি। আহ্বান করা হচ্ছে, প্রতিটা দেশ যেন নিজের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে এমনভাবে বদলে দিতে থাকে, যাতে ২০৫০ এর পর তার দেশ আর একটুও কার্বন-ডাই-অক্সাইড না ছাড়ে। অন্যভাবে বললে, যেটুকু কার্বন তখনো তার দেশ

নিঃসরণ করবে, তা যেন কোন না কোন প্রক্রিয়ায় সে ফের শোষণ করে নেয়।

ভারত এই প্রস্তাবে অরাজি না হলেও জানিয়েছে, এই পর্যায়ে পৌঁছতে তার ২০৭০ সাল পর্যন্ত সময় লাগবে। কেউ কেউ ভুরু কোচকালেও মূল সমস্যার প্রেক্ষিতে এই বিলম্বের আনুপাতিক ভূমিকা যে কম, সেটা সকলে বুঝতে পেরেছে। ২০৩০সালের মধ্যে কয়লার ব্যবহার ও অরণ্যবিনাশ বন্ধ করা (সেই কাজের সহায়ক হিসাবে ১০ হাজার কোটি ডলার ফান্ড তৈরি), মিথেন নিঃসরণে লাগাম পরানো, পরিবেশ বিপর্যয়ে পিড়িত দরিদ্র মানুষদের সাহায্যার্থে ফান্ড তৈরি, নিজের দেশে নিঃসৃত কার্বনের মাত্রা সীমানায় বেঁধে রাখার জন্য অন্য কোথাও অরণ্যায়ন ইত্যাদির মাধ্যমে বাতাস থেকে কার্বন সরানোর চেষ্টা করা, কার্বন নিঃসরণ এড়িয়ে শক্তি উৎপাদনের স্বার্থে বিকাশশীল দেশগুলোর হাতে অর্থ ও প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি তুলে দেওয়ার জন্য ১৩০ লক্ষ কোটি ডলার অর্থমূল্যের ফান্ড তৈরি করা, সবুজ শক্তি কে সাহায্য করার জন্য ব্যাংকগুলোকে উদ্বুদ্ধ করা এবং ২০৫০ এর মধ্যে কার্বন নিঃসরণ শূন্যে নিয়ে আসা - পরপর শুনে গেলে মনে হতে পারে আর কোন চিন্তা নেই, সমস্যা জটিল কিন্তু সমাধানও আছে। সবাই মিলে লেগে পড়লেই হলো।

এখানেই গন্ডগোল। সবাই সমান ভার নিতে রাজি নয়। তার মূলে রয়েছে ইতিহাস। ১৮৭০ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত যত কার্বন বাতাসে মিশেছে, তার শতকরা ৬১ ভাগ এসেছে পৃথিবীর ছয়টা উন্নত দেশ- আমেরিকা, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও জাপান এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে। সব মিলিয়ে তারা পৃথিবীর জনসংখ্যার মাত্র ১৫ শতাংশকে ধারণ করে আছে। আজকের চীনকে (জনসংখ্যার ভার ১৯ শতাংশ) মেলালে আটটি রাষ্ট্র (ও রাষ্ট্রগোষ্ঠী) বাবদ নিঃসৃত কার্বনের অংশ দাঁড়ায় ৭৪ শতাংশ। সেখানে ভারতের (পৃথিবীর ১৮ শতাংশ জনসংখ্যার দেশ) কার্বন নিঃসরণের অবদান মাত্র ৩.১৬ শতাংশ। ফলে ভারত বা তার মতো উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের পক্ষে উন্নত দেশের ন্যায় সমানভাবে, একই সময়ে কার্বন নিঃসরণ কমানো বা বন্ধ করা সম্ভব নয়। ।

প্রত্যাশা কি? :

পরিবেশ বিপর্যয়ের কু-পরিনাম কে মোটামুটি সামাল দেওয়ার অবস্থায় রাখার জন্য তাপমাত্রাকে ১.৫ থেকে ২ ডিগ্রিতে বেঁধে রাখার কথা পাকা হয়েছিল ২০১৫ এর প্যারিস সম্মেলনে (COP-21)। রাষ্ট্র গুলোর বিবেচক কর্মকাণ্ড ২০২০ -র পর থেকেই বিশ্বে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা কমাতে থাকবে এমন টা ধরে নিয়ে সেই হিসেব কষা হয়েছিল।দেখা যাচ্ছে, কাজে তা ঘটেনি। প্যারিস সম্মেলন এর আগে যেমন বাড়ছিল, ঠিক তেমনই বছরে গড়ে ১.৬শতাংশ হারে কার্বন নিঃসরণ বেড়েই চলেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম ২০২০ ওই বছর কোভিডের প্রভাবে নিঃসরণ কমেছে ৫.৪,কিন্তু তার পরেই , এই বছরের এখন পর্যন্ত পাওয়া হিসেবে ফের তা আগের উচ্চতায় ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। তা হলে! অঙ্গীকার মাখা অতীতের সম্মেলন গুলোর মত COP-26 ও কি ব্যর্থ হবে এমন আশঙ্কা অমূলক নয় ।

ওটেন সাহেব (প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক) কর্তৃক সুভাষচন্দ্র বসুর সম্বন্ধে রচিত ইংরেজি কবিতা এবং তার বাংলা রূপান্তর।

সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ওটেন সাহেবের কথা, যার পুরো নাম Mr.Edward Farley Oaten. মূলত ভারতবর্ষের মানুষের প্রতি বিরূপ মন্তব্য করার প্রেক্ষিতেই ১৯১৬-১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সঙ্গে অশান্তিতে জোড়ায় একদল ছাত্র এবং যাকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু এরকমই একটা ইতিহাস আমরা শুনতে পাই । এই ঘটনার প্রেক্ষিতে তাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্কটিশ চার্চএ ভর্তি হতে হয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এর সাহায্য নিয়ে। আমাদের কাছে ওটেন সাহেব বরাবরই 'খলনায়ক'। কিন্তু আমাদের খুব কম মানুষেরই জানা একটি অসাধারণ কবিতা সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে এই ওটেন সাহেব পরবর্তীকালে রচনা করেছিলেন। যা তাঁর 'Song of Aton and other verses' কাব্য গ্রন্থে পাই। শুধু তাই নয়,১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় 'ইন্টারন্যাশনাল নেতাজি সেমিনারে' ওটেন সাহেবকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। যখন তাঁর বয়স ৮৮ (অষ্টআশি) বছর। সেখানে তিনি ' The Bengal Student I knew him' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে বলেন , 'আমি পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্রের সামগ্রিক জীবনের সঙ্গে তাঁর কার্যাবলীর কে সর্বদা লক্ষ্য রেখে আসছিলাম। আমি পরে ভেবেছি তাঁর মহৎ জীবনের সঙ্গে আমার নামটা জড়িয়ে গেল।'

Subhas Chandra Bose
Oblit 1945

Did I once suffer, Subhas, at your hand?
Your patriot heart is stilled! I would forget.
Let me recall but his, that while as yet
The Raj that you once challenged in your land
Was mighty, Icarus - like your courage planned
To meet the skies, and strom in battle set
The ramparts of high Heaven, to claim the debt
Of freedom owed, on plain and rude demand.
High Heaven yielded, but in dignity
Like Icarus, you sped towards the sea
Your wings were melted from you by the sun,
The genial patriot fire that brightly glowed
In India's mighty her at and flamed and flowed
Forth from her Army's thousand victories won".

'কালি ও কলম' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় (১৩৭৬) ড. বিমানবিহারী মজুমদার লিখিত 'ওটেন ও সুভাষচন্দ্র' নামক প্রবন্ধে একান্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই

কবিতাটি সংযুক্ত হয়েছে। লেখক তাঁর আচার্য প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এর কাছ থেকে কবিতার পুস্তকখানা সংগ্রহ করেছেন। শ্রদ্ধেয় মজুমদার সাহেব এর কবিতার চমৎকার গদ্যানুবাদ টি হল:

সুভাষ ! তোমার হাতেই কি আমি একদিনে লাঞ্ছিত হয়ে ছিলাম? তোমার সেই স্বদেশ ভক্ত হৃদয়ের গতিবেগ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে! একথা ভুলিতে পারিলেই ভালো হইতো। আজ মনে পড়ে যে, তোমার দেশে তুমি যে রাজ শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ছিলে তাহা ছিল প্রচণ্ড। কিন্তু তুমি সাহেবের সাহসের সহিত 'আইক্যারাসে'র(গ্রীক পুরাণের জনৈক বীর) এর মত আকাশে উঠিয়া অমরপুরের দুর্গ প্রাচীর সংগ্রামের মধ্যে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার দুর্জয় সাহসময় সংকল্প করিয়াছিলে। তোমার উদ্দেশ্য ছিল তোমার দেশের যে স্বাধীনতা হরণ করা হইয়াছিল ও যাহার জন্য নিয়মতান্ত্রিক এবং রুঢ় রক্তাক্ত দাবি করা হইয়াছিল তাহা ফিরাইয়া পাওয়া। ক্যাবিনেট মিশন পাঠাইয়া সেই রাজশক্তি (High Heaven) তোমাদের দাবি মানিয়া লইতে রাজি হইয়া ছিল; কিন্তু তোমার সম্মান ও মর্যাদা বোধ তোমাকে আইক্যারাসে'র মত সমুদ্রের অভিমুখে চালিত করিয়াছিল । তোমার পাখা সূর্যের তাপে গলিয়া গেল। সেই তাপ হইতেছে ভারতমাতার বিশাল হৃদয়ে যে স্বদেশ ভক্তির আগুন প্রোজ্জ্বল ভাবে দীপ্তি পাইতেছিল তাহাই। ভারতীয় সেনাদলের সহস্র বিজয়ে এই দীপ্তি ভাস্বররূপে প্রবাহিত হয়েছিল।"

(কালি ও কলম -পৃষ্ঠা ১০০৫ থেকে ১০০৬)

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

স্বামী বিবেকানন্দের 'মন্ত্রশিষ্য' সুভাষচন্দ্র

শ্রী ব্রজ কিশোর ঘোষ

সূচনা:

নেতাজী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন - "Vivekananda entered my life". ত্যাগে বেহিসাবি, কর্মে বিরামহীন, প্রেমে সীমাহীন। ... আমাদের জগতে এরূপ ব্যাক্তিত্ব বিরল। স্বামীজি ছিলেন পূর্ণাঙ্গ মানুষ ... ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলে গেলেও সেই মহাপুরুষের বিষয় কিছুই বলা হবে না, এমনই ছিলেন তিনি মহৎ, এমনই ছিল তাঁর চরিত্র। ... আজ তিনি জীবিত থাকলে আমি তাঁর চরণেই আশ্রয় নিতাম"। উপরের কথাগুলি থেকেই বোঝা যায় স্বামী বিবেকানন্দ নেতাজীর জীবনে ঠিক কতখানি স্থান অধিকার করে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কোনদিন দেখা সাক্ষাৎ ও হয়নি। হবেই বা কিভাবে! তিনি যখন মাত্র ৫ বছরের বালক তখন স্বামীজী এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর আত্মজীবনীতে আমরা আরও পাই - "আমাদের এক আত্মীয় (সুহৃৎচন্দ্র মিত্র) নতুন কটকে এসেছিলেন। আমাদের বাড়ির কাছেই থাকতেন। একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁর ঘরে বসে বই ঘাঁটছি হঠাৎ নজরে পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের বইগুলোর উপর। কয়েক পাতা উল্টেই

বুঝতে পারলাম এই জিনিসই আমি এতদিন ধরে চাইছিলাম। বইগুলো বাড়ি নিয়ে এসে গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম। পড়তে পড়তে আমার হৃদয়মন আচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগল। প্রধান শিক্ষকমশাই আমার মধ্যে সৌন্দর্যবোধ, নৈতিকতাবোধ জাগিয়ে দিয়ে জীবনে এক নতুন প্রেরণা এনে দিয়েছিলেন কিন্তু এমন আদর্শের সন্ধান দিতে পারেননি যা আমার সমগ্র সত্তাকে প্রভাবান্বিত করতে পারে। এই আদর্শের সন্ধান দিলেন বিবেকানন্দ। দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল, আমি তাঁর বই নিয়ে তন্ময় হয়ে রইলাম। আমাকে সবচেয়ে বেশী উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁর চিঠিপত্র এবং বক্তৃতা। তাঁর লেখা থেকেই তাঁর আদর্শের মূল সুরটি আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলাম। "আত্মনো মোক্ষার্থম্ জগদ্ধিতায় চ।" মানবজাতির সেবার মধ্যেই আত্মার মুক্তি - এই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ।

আদর্শে উৎসর্গিত:

নেতাজীর ছাত্র জীবনে বিবেকানন্দ কতখানি জুড়ে ছিলেন একটা উদাহরণ দিলেই সেটা বুঝতে পারা যাবে। খুব ভালভাবে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে আই.এ ক্লাসে ভর্তি হন। কলেজে পড়ার সময়ই তিনি স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের দিকে আরও বেশী মন দেন এবং এক সময়ে তিনি সেবার উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগও করেন। পরাধীন ভারতবর্ষে তখন প্রয়োজন এক নবজীবনের উদ্দীপনা। সে যেন গীতার শ্রীকৃষ্ণের বাণীর অনুরূপ অবস্থা, যেখানে ভগবান নিজমুখে বলছেন 'দেশ ও জাতি যখন ধর্মের বদলে অধর্মের গ্লানিতে ডুবে যায়, তিনি তখন অবতীর্ণ হ'য়ে সেই দেশ ও জাতির ধর্ম স্থাপন করেন'। আমদের ভারতবর্ষ যখন নিজের গৌরবময় অতীত বিস্মৃত হয়ে নির্লজ্জ পরমুখাপেক্ষি ও অন্ধ অনুকরণে আসক্ত, তখন শ্রী রামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ এসে নতুন করে জাতির সত্তাকে নাড়া দিয়ে গেলেন। উনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে গোটা বিশ্বের বুকে হিন্দুধর্মের জয়ধ্বজা স্থাপন করে বীরের বেশে দেশে ফিরলেন বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজীর হিন্দুধর্মের প্রচার, প্রসার ও পুনরুজ্জীবনের মূল ভিত্তিই ছিল পরাধীন ভারতবাসীর ভাবের দৈন্যতাকে সরিয়ে দেওয়া; গৌরবময় অতীতকে স্মরণ-মনন। হিন্দুধর্মের চিরন্তন আদর্শগুলিকে সামনে নিয়ে এসে তিনি তাঁর স্বাদেশিকতার নবমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন আপামর যুবসমাজকে। তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধের মধ্যে পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশে যিনি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হয়ে উঠেছিলেন, তিনি হলেন দেশনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। স্বামী বিবেকানন্দকেই তিনি তাঁর গুরুজ্ঞানে আজীবন পুজো করে গেছেন। সুভাষের কথায়, "আমার সময়ের ছাত্রসমাজ স্বামীজীর রচনা ও বক্তৃতার দ্বারা যেরূপ প্রভাবিত হইয়াছিল, সেরূপ আর কাহারো দ্বারা হয় নাই — তিনি যেন সম্পূর্ণভাবে তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ...স্বামীজীর বাণীর মধ্য দিয়াই বর্তমান মুক্তি আন্দোলনের ভিত্তি গঠিত হইয়াছে। সুভাষচন্দ্র তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী বিভিন্ন লেখায়, চিঠিতে, বক্তৃতায় বারবার স্বীকার করেছেন যে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জীবনদর্শন ও মতাদর্শই তাঁকে একজন প্রকৃত চিন্তাশীল, কর্তব্যনিষ্ঠ, বীর,

নির্ভীক, মানবদরদী, বাস্তববাদী হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

মানবজাতির সেবা বলতে বিবেকানন্দ স্বদেশের সেবাও বুঝেছিলেন। তাঁর জীবনীকার ও প্রধানা শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা লিখে গেছেন, "মাতৃভূমিই ছিল তাঁর আরাধ্যা দেবী"। তিনি স্বামীজীকে উদ্দেশ্য করে বলেন - He himself was a condensed India. দেশের এমন কোনো আন্দোলন ছিল না যা তাঁর মনে সাড়া জাগায়নি। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর স্বদেশ মন্ত্রে বলেছেন, "হে বীর সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল – আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল - মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই....."। তিনি বলতেন যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, একে একে সকলেরই দিন গিয়েছে, এখন পালা এসেছে শূদ্রের, এতদিন পর্যন্ত যারা সমাজে শুধু অবহেলাই পেয়ে এসেছে। তিনি সবাইকে মনে করিয়ে দিয়ে বলেছেন, উপনিষদের বাণী হল, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য:' চাই শক্তি, নইলে সবই বৃথা। আর চাই নচিকেতার মতো আত্মবিশ্বাস।

সুভাষ চন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন এই শক্তি, এই আত্মবিশ্বাস যতক্ষণ আমাদের মধ্যে না আসছে আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা বৃথা। তাই তিনি মনেপ্রাণে স্বামীজীর আদর্শকে গ্রহণ করলেন। তাঁর নিজের ভাষায় - "বিবেকানন্দের আদর্শকে যে সময়ে জীবনে গ্রহণ করলাম তখন আমার বয়স বছর পনেরোও হবে কিনা সন্দেহ। বিবেকানন্দের প্রভাব আমার জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিল। তাঁর আদর্শ ও তাঁর ব্যক্তিত্বের বিশালতাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করার মতো ক্ষমতা তখন আমার ছিল না। কিন্তু কয়েকটা জিনিস একেবারে গোড়া থেকেই আমার মনে চিরকালের জন্য গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। চেহারায় এবং ব্যক্তিত্বে আমার কাছে বিবেকানন্দ ছিলেন আদর্শ পুরুষ। তাঁর মধ্যে আমার মনের অসংখ্য জিজ্ঞাসার সহজ সমাধান খুঁজে পেয়েছিলাম। প্রধান শিক্ষকমশাইয়ের আদর্শকে তখন আর খুব বড় বলে মনে করতে পারছিলাম না। আগে ভাবতাম প্রধান শিক্ষকমশাইয়ের মতো দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করব, তাঁর আদর্শে জীবনকে গড়ে তুলব। কিন্তু এখন স্বামী বিবেকানন্দের পথই আমি বেছে নিলাম।" বালক বয়স থেকে স্বামী বিবেকানন্দকেই মনে মনে তাঁর মন্ত্রগুরু মেনে নিলেন সুভাষ। শান্ত, ভদ্র, সংযত সুভাষ কিছুতেই মেনে নিতে মানতে পারলো না ব্রিটিশ শাসনের বেড়াজাল। বয়ঃসন্ধি- ক্ষণে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি আনুগত্য তাঁকে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান করে তুলল। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের বাণী 'আত্মসংযম বিনা আধ্যাত্মিক উন্নতি অসম্ভব', বা 'একমাত্র অনাসক্তির মধ্য দিয়েই মুক্তি আসতে পারে' ইত্যাদিও তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে তুলল। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মধ্যে দেখতে পাই ভারতবর্ষের অধ্যাত্মবাদ, ধর্ম ও জীবনদর্শন এবং পূর্বেকার সব মহাপুরুষদের বাণী তাঁর মাঝে মূর্তরূপ লাভ করেছিল। এবং তিনি তাঁর সমস্ত কিছু উজাড় করে তাঁর প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দকে সেই আদর্শেই গড়ে তোলেন। আর স্বামীজী যেন ঘুমিয়ে পড়া ভারতবর্ষকে এক আধ্যাত্মিক বিস্ফোরণে জাগিয়ে তোলেন, এবং ভারতবাসীর অন্তরে স্বাধীনতার

বীজমন্ত্রও তিনিই রোপন করে যান। তাঁর সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য জীবনপাত করলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

আদর্শের বাস্তবায়ন:

"বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ" বইতে মোহিতলাল লিখেছেন:

"নেতাজী যে এক অর্থে স্বামীজীর মানসপুত্র তাহাতে সন্দেহ নাই; একজনের হৃদয়ে যাহা বীজরূপে ছিল আর একজনের জীবনে তাহাই বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়াছে। ..... যে সাক্ষাৎ-মুক্তি স্বামীজীর অন্তরে একটি প্রবল শক্তিরূপে বিরাজ করিত, নেতাজীও সেই মুক্তিকে অন্তরে লাভ করিয়াছিলেন। দুইজনের প্রেমও সেই মুক্ত-প্রাণের পরার্থ-প্রীতি। স্বামীজীর ..... সেই বিশাল হৃদয়ের নিপীড়িত কামনাই নেতাজীর মধ্যে অকুণ্ঠ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। স্বামীজী যদি গেরুয়া ত্যাগ করিতেন তবে সে আর কিছুর জন্য নয়, ঐ আজাদ-হিন্দ্-ফৌজের "নেতাজী" হইবার জন্য। সেই প্রেম তাঁহারও ছিল, কেবল সেজন্য জ্ঞানের তপস্যাকে সংবরণ করিয়া কিছুকাল প্রেমের সমাধিতে সংজ্ঞাহারা হইতে হইত। অতএব স্বামীজীর মধ্যে আমরা যেমন নেতাজীর ঐ প্রেমের মূল দেখিতে পাই, তেমনই নেতাজীর মধ্যে স্বামীজীর সেই বাণীকেই মূর্তিমান হইতে দেখি সেই একমন্ত্র – 'Believe that you are free, and free you will be'."

তৎকালীন ভারতবর্ষের যুব-সমাজ, বিশেষ করে স্বাধীনতাকামী যুবকের দল স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে অনুপ্রাণিত। ভারতবর্ষ জুড়ে, বিশেষত বাংলায়, সে এক উদ্দাম হৃদয়ের উত্তাল ছবি। সেই যুবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে নেতাজীর জুড়ি মেলা ভার। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করার জন্য যে সকল বিপ্লবী ও লড়াকু যোদ্ধা জীবন উৎসর্গ করেছেন, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু শুধু প্রথম সারিতেই নন, তাঁদের মধ্যেও তিনি ছিলেন অন্যতম। অহিংসায় নয়, উদারতায় নয়, শক্তি প্রয়োগ করেই ব্রিটিশকে ভারত থেকে তাড়াতে হবে, এই মন্ত্রে বলীয়ান হয়েই তিনি আমৃত্যু লড়াই চালিয়েছেন ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে। তাই তিনি অকপটে দ্বিধাহীনভাবে ভারতের যুব সম্প্রদায়কে বলতে পেরেছিলেন "তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব"।

স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। সেটা তখনই সম্ভব যখন আমরা আমাদের আত্মিক চেতনায় পরিপুষ্ট হয়ে যথার্থ দেশপ্রেমিক হয়ে উঠতে পারবো। উদাত্ত কণ্ঠে আমরা বলে উঠব, "ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।" স্বামীজীর এই স্বদেশচেতনাকে নিজের জীবনের আদর্শ করে স্বামীজীর সুপ্ত বাসনা, মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার বাসনাকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে স্বীকার করে এগিয়ে গেলেন সম্মুখসমরে, সুভাষচন্দ্র বসু। উপনিষদ বলে 'আমরা অমৃতের সন্তান'। স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন অন্তর্প্রকৃতি দ্বারা বহির্প্রকৃতিকে জয় করে আমরা পৃথিবীতে প্রাণের বন্যা বইয়ে দেবো। স্বামীজীর আদর্শ অনুসরণ করে যথার্থ দেশপ্রেমিক হয়ে উঠতে সুভাষচন্দ্রও তরুণদের আহ্বান জানিয়েছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ সালে মাদ্রাজের এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে আগামী ৫০ বছর

ভারতবর্ষের যুবসমাজের একমাত্র আরাধ্য দেবী হলেন ভারতমাতা। সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করে সুভাষচন্দ্র বললেন - "বঙ্গজননী আবার একদল নবীন তরুণ সন্ন্যাসী চান। ভাই সকল, কে তোমরা আত্মবলির জন্য প্রস্তুত আছ, এসো। মায়ের হাতে পাবে তোমরা শুধু দুঃখ, কষ্ট, অনাহার, দারিদ্র্য ও কারাযন্ত্রণা। যদি এই সব ক্লেশ ও দৈন্য নীরবে নীলকণ্ঠের মত গ্রহণ করতে পার তবে তোমরা এগিয়ে এসো, তোমাদের সবার প্রয়োজন আছে। ভগবান যদি করেন, তোমরা যদি শেষ পর্যন্ত জীবিত থাক তবে স্বাধীন ভারত তোমরা ভোগ করতে পারবে। আর যদি শেষ পর্যন্ত জীবিত না থাক-তবে স্বাধীন ভারত তোমাদের উত্তরসূরীরা ভোগ করতে পারবে। যদি স্বদেশসেবার পুণ্য প্রচেষ্টায় ইহ-লীলা সংবরণ করতে হয়, তবে মৃত্যুর পর স্বর্গের দ্বার তোমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হবে। তোমরা যদি প্রকৃত বীর সন্তান হও তবে এগিয়ে এসো।

সুভাষচন্দ্র বসু ও নেতৃত্বের আদর্শ

শ্রী সমীর কুমার দাশগুপ্ত
সহকারী সম্পাদক, বিবেক জীবন, দ্বিভাষিক মাসিক পত্রিকা, অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে যেসব বরেণ্য নেতৃবৃন্দ জীবন অর্পণ করে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে একমাত্র সুভাষ চন্দ্র বসুকেই 'নেতাজি' আখ্যায় ভূষিত করা হয়। 'নেতাজি' বলতে আমরা সুভাষচন্দ্র বসুকেই বুঝে থাকি, অন্য কাউকে নয়।নেতৃত্বের আদর্শ ও গুণাবলীর নিরিখে তিনি কেবল ভারতবর্ষেই নয়, বরং সমগ্র বিশ্বে এক অনন্য ও অদ্বিতীয় চরিত্র। সুভাষ চন্দ্রের জীবনে নেতৃত্তের আদর্শ যে অত্যুঙ্গ শিখরে পৌঁছেছিল তার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ মহাকাব্যিক। সেজন্য এখানে স্বল্প পরিসরে আমরা তার নেতৃত্বের মাত্র কয়েকটি দিকেই দৃষ্টি দেওয়ার চেষ্টা করব। বিস্তৃত ঘটনা বর্ণনা না করে তার সামান্য উল্লেখের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করব কী অর্থে তিনি যথার্থ আদর্শ নেতা।

নেতার সংজ্ঞা:

আধুনিককালে Jack Weleh খুব সুন্দর ভাবে নেতার সংজ্ঞা দিয়েছেন। নেতা হলো "someone who

can develop vision of what he or she want business, their unit, their activity to do and be. Somebody who is able to articulate to the centre unit what the unit it is and grain through a sharing of the discussion- listening and talking- an acceptance of that vision. And then relentlessly drive implementation of that vision to a successful conclusion" (Michel Robert লিখিত The Essence of Leadership এ উদ্ধৃত) অর্থাৎ তাঁর মতে, একজন নেতা তাঁর সংগঠন, তাঁর কার্যাবলী ভবিষ্যতে কি করবে বা কি হবে সে বিষয়ে একটা স্পষ্ট ধারণা - একটা পরিস্কার দৃষ্টিভঙ্গি, মনশ্চিত্তে গড়ে তুলতে সক্ষম। সংগঠনের সকল সদস্যের নিকট সমগ্র সংগঠনের পূর্ণ চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হবে এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে- অন্যের কথা শোনা ও নিজের বক্তব্য বিষয় বলার মাধ্যমে নেতা তার নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিটি সংগঠনের অন্যান্যের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেন। অবশেষে অবিরাম কঠোর প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাঁর উদ্দেশ্য, তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবে রূপ দিতে সমর্থ হবেন।

এই নেতৃত্বে জীবন্ত উদাহরণ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জীবন, বিশেষ করে যখন তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের উদ্দেশ্যে।

সুভাষের জীবনে এর প্রতিফলন:

নেতৃত্বের উপর এই সংজ্ঞার নিরিখে আমরা সংক্ষেপে সুভাষচন্দ্রের জীবনে নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য কিভাবে ফুটে উঠেছিল তা এখন দেখব।

প্রথমত: The leader has a clear vision for the the organisation. আমরা দেখি সুভাষ চন্দ্রের জীবনে, যৌবনের প্রারম্ভে তাঁর সামনে প্রথমাবধি একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিল। তাঁর জীবনের ব্রত ছিল মাতৃভূমির দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচন, পূর্ণ স্বরাজ, পূর্ণ স্বাধীনতা, তার চেয়ে কম নয় বা মাঝামাঝি কোন অবস্থা নয়। এই স্পষ্ট স্বপ্ন নিয়েই তাঁর পথ চলা। দেশ ও জাতির প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতা যে মনোভাব তাঁর কৈশোর যৌবনে গড়ে উঠেছিল, তাই তাঁকে এ পথের- 'ভারত কল্যাণ'-পথের পথিক করেছিল।

দ্বিতীয়তঃ The leader should have the ability to communicate this vision to others. তাঁর এই মনশ্চিত্তের, তাঁর এই স্বপ্ন তিনি কেবল নিজের মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি, যাঁরা তাঁর সহযোগী হিসাবে এই কর্মযজ্ঞে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের সকলের মনে এই ভাব দৃঢ় রূপে অঙ্কিত করে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। সেজন্য আমরা দেখি, আজাদ হিন্দ ফৌজ এর সকল সহযোগী-সৈন্য তাঁদের উদ্দেশ্য হিসাবে ভারতের পুরনো স্বাধীনতাকে নির্বাচন করেছিলেন, এ বিষয়ে তাঁদের মনে কোনো

মানসিক বাধা (inhibition) বা দ্বৈতভাব (ambivalence) ছিলনা; তাঁদের সংগ্রাম তাঁদের নেতাজির প্রতি 'ব্যক্তিগত' আনুগত্য এক 'অজানা' আকর্ষণ বোধ থেকে জন্ম নেয়নি।নেতাজির কৃতিত্ব তিনি সহযোগীদের মনে সংগ্রামের পূর্নচিত্র প্রোথিত করে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন।

তৃতীয়তঃ The leader should have the the capacity to motivate others to work toward the vision. নেতাজি এভাবে তাদের মনে আদর্শ উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন বলেই আজাদ হিন্দ ফৌজের হাজার হাজার সৈন্য রণাঙ্গনে অক্লেশে জীবন উৎসর্গ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেননি, স্বেচ্ছায় পূর্ণ্য যজ্ঞানলে আহুতি দিয়েছিলেন সানন্দে।

চতুর্থতঃ A leader should have the ability to 'work the system' to get things done. নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনে দেখি ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার সমস্ত প্রণালী, সকল উপায় তাঁর কাছে কেবল পরিষ্কার ছিল তা নয়, তাকে কার্যকর করার সুনির্দিষ্ট রূপরেখা রেখা এর জন্য চাই দূরদর্শিতা, ভবিষ্যদৃষ্টি (foresight and farsight)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে আসন্ন, টা তিনি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন, যা ভারতের প্রধান নেতারা বুঝে উঠতে পারেননি। নাৎসি জার্মানি ও আগ্রাসী জাপানের কঠোর সমালোচক হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদের সাহায্য নিয়েছিলেন ভারতের সামনে একটা সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে এবং সেক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র আত্মমর্যাদা ক্ষুন্ন করেননি। সম-মর্যাদার ভিত্তিতে তিনি তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছিলেন, বার্লি ও টোকিওতে সে কথা স্পষ্ট ভাবে জার্মান চ্যান্সেলর হিটলার ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী তেজ ওকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। জাপানের হাতে 'পুতুল' হিসাবে নয়,- যা জহরলাল নেহেরু বলেছিলেন- বরং কৌশল (Stretegy)হিসাবে জাপানের সাহায্য নিয়েছিলেন।

দেশ স্বাধীন হলে সরকার কেমন হবে, কেমন হবে তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব ইত্যাদি বিষয়েও তাঁর একটা সুস্পষ্ট ধারণা, চিন্তা ছিল। সে বিষয়ে হয়তো আমরা অনেকেই জানিনা। সে সব বিষয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব না অনেকে মনে করেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রত্যক্ষভাবে এনে দিতে সমর্থ হন নি। কিন্তু সে কথা ঠিক নয়। অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণ করেছেন, এমনকি তদানীন্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি স্বীকার করেছেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্যই ভারতবর্ষ দ্রুত স্বাধীনতা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল।

সুভাষচন্দ্র যে আদর্শ নেতা হয়ে উঠতে পেরেছিলেন, তার কারণ তিনি স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে নিজেকে তিলে তিলে তীব্র সাধনার মাধ্যমে গড়ে

তুলেছিলেন। সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য, সম্পূর্ণ সেবাপরায়ণ, সম্পূর্ণ উদার মনোভাব নিয়ে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দেশ ও জাতির প্রতি অসীম ভালবাসা ও কর্তব্যবোধ থেকে।

তিনি দেশের মানুষের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তা কখনো মনে করতেন না, তিনি মনে করতেন তিনি দেশমাতৃকার সেবক, জনসাধারণের 'দাসস্য দাস'। সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে হিন্দু, মুসলমান, শিখ ইত্যাদি নানা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন সংঘ স্থাপন করেছিলেন, তেমন ভারতের মানা প্রদেশের মানুষদের জাতপাত, প্রাদেশিকতার বাধা কে উপেক্ষা করে এক জাতীয় লক্ষ্যে সমবেত করতে পেরেছিলেন। কেবল তাই নয়, কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ বারবার তাঁর কর্মপ্রয়াসকে বাধা দেবার চেষ্টা করলেও পদে পদে তাঁর বিরোধিতা করলেও তিনি ব্যক্তিগত মতানৈক্যকে প্রশ্রয় দেননি। দেশ ও জাতি বা আদর্শের কাছে অহংবোধ, ব্যক্তিগত মতবিরোধ কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। এ বিষয়ে তখনকার অনেক নেতাই এর উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। সেজন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের আমরা দেখি গান্ধী ব্রিগেড, নেহেরু ব্রিগেড, প্যাটেল ব্রিগেড তৈরি করতে। একে বলে বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি। সকলের সেবক মনে করতেন বলে কখনো অন্যদের চেয়ে বেশি সুবিধা নিতেন না। যুদ্ধের সময় যখন খাদ্য সংকট দেখা দিল, তখন একবার তাঁকে সর্বাধিনায়ক বলে একটু সামান্য বেশি আহার দেওয়া হয়েছিল অন্যান্য সৈন দিচ্ছে এবং তা সংগতই ছিল, কারণ তাঁকে সকলের চেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হতো। কিন্তু তিনি বিরক্তির সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

জীবনের প্রতি পদক্ষেপে ধরে থাকায় একজন প্রকৃত নেতার বৈশিষ্ট্য। সেজন্য কখন আদর্শের সঙ্গে আপোষ করেননি।আদর্শের জন্য পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে আই. সি. এস পরীক্ষায় পাশ করেও সরকারি চাকরি না নিয়ে দেশমাতৃকার সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন।ছাত্র জীবনে অধ্যাপকের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে দ্বিধা করেননি আদর্শের প্রতি অটুট নিষ্ঠার জন্য। এজন্য চরম শাস্তি গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হননি। তাইতো তিনি বলতেন " এই নশ্বর পৃথিবীতে বিনষ্ট হবে সবকিছুই- কেবল নষ্ট হবে না ভাব, আদর্শ ও স্বপ্ন। কোন একটি ভাবের সাধনায় ব্যক্তি মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে,- কিন্তু সেই ভাবটি তাঁর মৃত্যুর পরে পুনর্জন্ম নেবে সহস্য জীবনে।" স্বামী বিবেকানন্দ একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন,"জীবন ক্ষণস্থায়ী... মৃত্যু নিশ্চিত... এস একটা মহান আদর্শ নিয়ে তার জন্য সমস্ত জীবন নিয়োজিত করি।" নেতাজি যেন স্বামীজীর বাণীর মূর্তমান বিগ্রহ - সংসার সমাজের যুদ্ধক্ষেত্রে।

তাঁর অবিশ্বাস্য আত্মত্যাগ, অসীম সেবাপরায়নতা, তার দূরদর্শিতা, অসম সাহসিকতা, সম্পূর্ণ অহংশূন্যতা তাঁকে আদর্শ নেতায় রূপান্তরিত করেছিল, করেছিল ভারতের প্রকৃত মহানায়ক - দেশনায়ক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৃথাই তাকে জাতির পক্ষ থেকে 'দেশনায়ক' রূপে বরণ করেননি।

তরুণের স্বপ্ন ও সুভাষচন্দ্র

শ্রী অরুণাভ সেনগুপ্ত

কার্যনির্বাহী সদস্য, অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল

সুভাষচন্দ্রের তারুণ্যের ঊষালগ্নে তাঁর হৃদয় অধিকার করেছিলেন তারুণ্যের বিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দ। আত্মজীবনী "ভারত পথিক'-এ সুভাষচন্দ্র লিখেছেন, ""আমার বয়স তখন বড়জোর পনেরো, যখন স্বামী বিবেকানন্দ আমার ভেতরে প্রবেশ করলেন। তারপর আমার অন্তর্জগতে একটা বিপ্লব ঘটে গেল, সবকিছু ওলট পালট হয়ে গেল।" স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ""মরে তো যাবিই, একটা বড় উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা।" সুভাষচন্দ্র তাঁর জীবনের বৃহৎ উদ্দেশ্য লাভ করলেন স্বামী বিবেকানন্দের কাছে, আর শিখলেন তারুণ্য শক্তির যথার্থ সদ্ব্যবহার করতে। মনোবিজ্ঞানের একটি আধুনিক ধারা Positive Psychology বলে, আমাদের গতানুগতিক জীবনের আবর্ত পেরিয়ে একটা বৃহৎ উদ্দেশ্যের জন্য বাঁচতে শেখাই যথার্থ আনন্দের পথ। উপনিষদও বলেছে, "যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি" – যা বৃহৎ তাতেই সুখ আছে, ক্ষুদ্র জিনিসে যথার্থ সুখ নেই। সুভাষচন্দ্র উপলব্ধি করলেন যথার্থ আনন্দ ক্ষুদ্র সুখে নেই, আছে পরার্থে আত্মবলিদান ও দুঃখ বরণের মধ্যে। মাত্র আঠেরো বছর বয়সে একটি চিঠিতে লিখেছেন, আমার জীবনে একটা mission আছে। সেই মিশন বা উদ্দেশ্যের দুটি দিক ছিল – realization and renunciation – মানবজীবনের সুপ্ত মহিমার পূর্ণ উপলব্ধি ও পরার্থে স্বার্থত্যাগ। যৌবনের উন্মেষ যেমন নতুন নতুন সমস্যা নিয়ে আসে জীবনে, সেসবের সমাধানের সমগ্র সম্ভাবনাও নিহিত থাকে যৌবনের শক্তিতে। সেই শক্তির সদ্ব্যবহারের জন্য সুভাষ উঠে পড়ে লাগলেন। নিজের শরীরকে বলিষ্ঠ করে তুলতে হবে, মনকে করে তুলতে হবে তেজোপূর্ণ, বুদ্ধিকে করতে হবে শাণিত, আর হৃদয় হবে উদার প্রেমপূর্ণ স্বার্থশূন্য। স্বামীজী বলেছিলেন, "জগৎ চায় চরিত্র। জগৎ চায় এমন মানুষ, যাদের জীবন প্রেমপূর্ণ, স্বার্থশূন্য। অনন্ত প্রেম ও করুণা নিয়ে শত শত বুদ্ধের আবির্ভাব প্রয়োজন।" সেইভাবে তৈরি হতে লাগলেন সুভাষ।

স্বামীজীর কাছে সে আরেকটি জিনিস পেল – এক নতুন ভারত গড়ার স্বপ্ন ও পথের সন্ধান! স্বাধীন, অখণ্ড, ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ – বৈচিত্র্য যেখানে ঐক্যকে খণ্ডিত করে না, আরও সমৃদ্ধ করে। যে ভারত কেবলমাত্র হিন্দু বা শুধু মুসলমানের হবে না, যার জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধিজাত সর্বধর্মসমন্বয়ের শক্ত ভিতের ওপর। যে জাতীয়তার উপজীব্য হবে সাম্য, মৈত্রী ও মুক্তি, যার শক্তির উৎস হবে জাগ্রত জনসাধারণ, বিশেষ করে এখনকার পেছিয়ে পড়া শ্রেণী।

এই আদর্শকে, এই স্বপ্নকে রূপ দেওয়া সহজ কাজ ছিল না। সকলের ক্ষেত্রেই যেমন হয়ে থাকে, সুভাষের জীবনেও এসেছিল তুমুল সংগ্রাম – শুধু বাইরে নয়, মনের ভেতরকার সংগ্রাম। সংগ্রামের মধ্যে একটা

আনন্দ আছে, একটা দুঃসাহসিক অভিযানের spirit আছে। কারণ প্রতি মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা। ভেড়ার পালের মধ্যে প্রতিদিনের একঘেয়ে জীবন কাটানোর চেয়ে মৃত্যুও ভালো লাগে adventure-প্রিয় নির্ভীক যুবকের, তার কাছে ""পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার — সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা"! এই সংগ্রামই ক্রমে তরুণ সুভাষকে অনন্য করে তুলেছিল ভারতের নেতৃবৃন্দের মধ্যে।

জাতীয় আত্মসম্মানবোধ তাঁকে ব্রিটিশের গোলামি করতে দিল না। ইংল্যাণ্ডে আইসিএস পরীক্ষায় চতুর্থ হয়েও স্বর্গসুখ ও সম্মানের হাতছানি হেলায় উপেক্ষা করলেন। ভারতে ফিরেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেশের সেবায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও কর্মদক্ষতার সঙ্গে খাটতে লাগলেন দিবারাত্র। বারবার কারারুদ্ধ হলেন। ব্রিটিশরা তাঁকে বিনা বিচারে বর্মার মান্দালয় জেলে বন্দী করে রাখল। একটানা আড়াই বছর কারাবাসের পর সুভাষ যখন ছাড়া পেলেন, তখন তাঁর মনের গভীরতা বেড়ে গেছে আরো শত গুণ। বয়েস তখন সবে তিরিশ। কারাবাস তাঁর দৈহিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পেরেছিল, কিন্তু মনকে মোটেই কাবু করতে পারেনি। জেলের মধ্যেও দেশমাতৃকার জন্য দুঃখবরণের গৌরব মনকে আনন্দে ভরিয়ে রাখত। মান্দালয় থেকে লেখা তাঁর চিঠিপত্র আদর্শবোধ, প্রতিভাদীপ্তি ও হাস্যরসে পূর্ণ। ""জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।" বলতেন, মানুষ মরে যায়, কিন্তু যে idea-র জন্য সে বাঁচে, সেই idea কখনো মরে না, ক্রিয়াশীল থাকে — কোন না কোন দিন বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করবে বলে।

সেই বোধ থেকে জন্ম নিল তরুণের আহ্বান। নিজের ভেতরে যে আগুন জ্বলে উঠেছিল, তা তিনি ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগী হলেন। বহু যুবকের প্রাণের প্রদীপ সেই আগুনের তাপে জ্বলে উঠতে লাগল। তিনি সর্বত্র যুব সম্মেলন ইত্যাদিতে দেশের যুবদলকে সম্বোধন করে শোনাতে লাগলেন তাঁর হৃদয় থেকে উৎসারিত আহ্বান। যেন স্বামীজীর প্রেম, স্বামীজীর আহ্বানই আড়াই দশকের দূরত্ব অতিক্রম করে তাঁর ভেতর দিয়ে অপ্রতিহত বেগে প্রবাহিত হতে লাগল। তিনি বললেন, "ওগো আমার তরুণ জীবনের দল, তোমরা ওঠো, জাগো, ঊষার কিরণ যে দেখা দিয়েছে!" বললেন, "হে বাংলার ছাত্র ও তরুণ সমাজ! তোমরা পরিপূর্ণ ও অখণ্ড মুক্তির উপাসক হও। তোমরাই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী; অতএব তোমরাই সমস্ত জাতিকে জাগাইবার ভার গ্রহণ গ্রহণ করো। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে অনন্ত, অপরিসীম শক্তি। এই শক্তির উদ্বোধন করো এবং এই নবশক্তি অপরের মধ্যে সঞ্চার করো; তোমাদের নিকট নূতন স্বাধীনতামন্ত্রে দীক্ষিত সমস্ত জাতি আবার বাঁচিয়া উঠুক!"

সুভাষচন্দ্র তরুণের আদর্শ সম্পর্কে সংক্ষেপে অতি চমৎকার কথা বললেন: "তরুণের আদর্শ কি? তরুণের আদর্শ — বর্তমানের সকল প্রকার বন্ধন, অত্যাচার, অবিচার ও অনাচার ধ্বংস করিয়া নূতন সমাজ ও নূতন জাতি সৃষ্টি করা।" অর্থাৎ এই আদর্শ ব্যক্তির আত্মোন্নতিতে সীমায়িত নয়, পরন্তু দেশ ও বিশ্বের সকল মানুষের কল্যাণের স্বপ্ন ও সাধনা। এই স্বপ্নের সাধনা বিচ্ছিন্ন ভাবে এক-একটি ব্যক্তির একক সাধনা নয়। এই স্বপ্ন নিয়ে যেসব তরুণেরা উদ্বুদ্ধ হয়েছে, তাদের সমবেত, সংহত, সঙ্ঘবদ্ধ সাধনা — একই উদ্দেশ্যের

দিকে ধাবমান তরুণদের সুপরিকল্পিত, সুশৃঙ্খল একটি আন্দোলন, যে আন্দোলনকে রূপ দেওয়ার জন্য প্রয়োজন সঙ্ঘশক্তি, প্রয়োজন প্রতিষ্ঠান।

একের পর এক বক্তৃতায় এই যুব আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে বললেন "আমরা মনে করতে পারি যে, তরুণদের রচিত যে-কোনো প্রতিষ্ঠান — যেমন সেবা সমিতি, যুবক সমিতি তরুণ সংঘ আখ্যা পাইবার যোগ্য, কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। যে প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের মূলে স্বাধীন চিন্তা ও নূতন প্রেরণা নাই, সে প্রতিষ্ঠান বা সে আন্দোলন তরুণের আন্দোলন বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। তরুণ প্রাণের লক্ষণ কি? — লক্ষণ এই যে, সে বর্তমানকে বা বাস্তবকে অখণ্ড সত্য বলিয়া গ্রহণ করতে পারে না, সে বন্ধনের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে চায় এবং সে আনিতে চায় ধ্বংসের মহাশ্মশানের বুকে সৃষ্টির অবিরাম তাণ্ডব নৃত্য। ধ্বংস ও সৃষ্টির যে মধ্যে আত্মহারা হইতে পারে, একমাত্র সেই ব্যক্তিই তরুণ। তারুণ্য যার আছে, সে ধ্বংস ও সংগ্রামের ছায়া দর্শনে ভীত হয় না, অথবা নবসৃষ্টিরূপ কার্যে অপরাগ হয় না।...

"কেহ কেহ অজ্ঞতাবশত মনে করিয়া থাকেন যে, যুব-আন্দোলন রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের নামান্তর মাত্র — কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়। ফুল ফোটে, তখন প্রত্যেক পাপড়ির মধ্যে তার সুষমা ও সৌরভ আত্মপ্রকাশ লাভ করে। বহুদিন শয্যাশায়ী থাকার পর মানুষ যখন পূর্বস্বাস্থ্য ফিরিয়া পায়, তখন শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের ভিতর দিয়া শক্তি, তেজ ও প্রফুল্লতা ফুটিয়া ওঠে। শৈশব ও কৈশোর পার হইয়া আমরা যখন যৌবন-রাজ্যে অভিষিক্ত হই, তখন প্রকৃতিদেবী সকল সম্পদে আমাদিগকে ভূষিত করেন। শারীরিক শক্তি, মানসিক তেজ, নৈতিক বল, শৌর্য, বীর্য — আমরা মানুষ হইয়া উঠি। ব্যক্তির জীবনে যতগুলি দিক আছে এবং জাতির জীবনে যতগুলি দিক আছে — ততগুলি দিক আছে যুব-আন্দোলনের। এই বিচিত্র আন্দোলনের বিভিন্ন রূপের মধ্যে কোনো রূপটি হেয় নয়। এই রূপের সমষ্টিতে যে অভিনব সৌন্দর্য-সৃষ্টি হয়, তাহাই যুবক মাত্রেরই কাম্য ও সাধ্য।...

"কোনো ism-এর বা মতবাদের দ্বারা মানবজাতির উদ্ধার হইতে পারে না, যদি সর্বাগ্রে আমরা মনুষ্যোচিত চরিত্রবল লাভ না করিতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলিতেন, 'Man-making is my mission' — মানুষ তৈরি করা আমার জীবনের উদ্দেশ্য। জাতিগঠনের এবং ism প্রতিষ্ঠার ভিত্তি — খাঁটি মানুষ। খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করা যুব আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করিতে হইলে সবদিক দিয়া তাহার বিকাশ হওয়া চাই।"

রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আন্দোলন পরিচালনার সময়েও বলেছেন, "Our struggle is, no doubt, a non-violent struggle. But even a non-violent struggle demands an army, an organization and machinery." — আমাদের সংগ্রাম নিঃসন্দেহে অহিংস সংগ্রাম। কিন্তু এমনকি অহিংস সংগ্রামের জন্যও একটি সেনাবাহিনী, একটি সংগঠন ও সঙ্ঘযন্ত্রের প্রয়োজন। ১৯৩০-এর দশকের

শেষভাগে, যখন তিনি সর্বভারতীয় নেতৃত্বের শীর্ষে, তখন তিনি দেশের যুবসমাজের হৃদয়কে সর্বতোভাবে অধিকার করেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বরণ করে নিয়েছেন দেশনায়কের পদে। আধুনিক বিজ্ঞান ও শিল্পায়নের মাধ্যমে নবভারতের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ তৈরির জন্য তাঁর যে পরিকল্পনা ছিল, তার অন্যতম দৃঢ় সমর্থক তখন ডঃ মেঘনাদ সাহা প্রমুখ বহু প্রগতিশীল ব্যক্তি। কিন্তু রাজনীতির পঙ্কিল আবর্ত ও বারংবার কারাবাস তাঁর সংগ্রামের পথ অবরুদ্ধ করেছিল। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন ঘটাতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ফলে জীবনের চূড়ান্ত ঝুঁকি নিয়ে ছদ্মবেশে চলে গেলেন জার্মানি। সেখান থেকে আবার সাবমেরিনে শত্রু-অধ্যুষিত সমুদ্রপথে অর্ধেক পৃথিবী অতিক্রম করে গেলেন দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায়। শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু — যে করে হোক, দেশকে স্বাধীন করতে হবে, তারপরেই দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন করে দেশের কোটি কোটি অভুক্ত মানুষের মুখে অন্ন তুলে দিতে হবে, শিক্ষার প্রসার করতে হবে! ভেঙে পড়া ক্ষুদ্র আজাদ হিন্দ বাহিনীকে নতুন করে গড়ে তুললেন ৪০,০০০ সেনার এক শক্তিশালী বাহিনী, স্বাধীন অস্থায়ী সরকার। জাপান সাহায্য করল, কিন্তু সেই সাহায্য ছিল বন্ধুরাষ্ট্রের দেওয়া ঋণ, যা স্বাধীনতার পরে কড়ায় গণ্ডায় শোধ করার কথা ছিল। হাজারে হাজারে প্রবাসী ভারতীয় তরুণ তরুণী সেই সংগ্রামে যোগ দিল তাঁর আহ্বানে — যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিল ২১,০০০ সেনা। তাদের চোখে যে স্বপ্ন তিনি দিয়েছিলেন, তা সারা ভারতের যুবসমাজে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ল তাদের আপাত পরাজয়ের পরে, যখন তাদের বিচার শুরু হল দিল্লীর লালকেল্লায়। ব্রিটিশ-ভারতের সেনাবাহিনী ও বিশেষ করে নৌবাহিনীতে তরুণ সৈনিকরা বিদ্রোহ করল। তখন ব্রিটিশরা বুঝল, আর ভারত সাম্রাজ্য ধরে রাখা যাবে না।

কিন্তু স্বাধীন ভারতে সেই বীরগাথা দীর্ঘকাল চেপে রাখার চেষ্টা করে এসেছে দেশের সরকার। সত্য ইতিহাস তাই আমাদের নিজেদের চেষ্টায় আবিষ্কার করতে হবে, যাতে আবার আমরা সেই প্রেরণা ফিরে পেতে পারি, আবার তরুণের হৃদয়ে জ্বলে ওঠে সেই আগুন। তবেই সার্থক হবে জীবন, তবেই গড়ে উঠবে আপামর জনসাধারণের নতুন ভারত।

দেশবন্ধু ও দেশনায়ক: ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে

শ্রী অয়ন চক্রবর্তী, শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ, পূর্বস্থলী কলেজ পূর্ব বর্ধমান

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু - এই দুই মহাপ্রানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং সাক্ষাতের সময়কাল ইতিহাসের বিচারে খুব স্বল্পকালের, মাত্র চার বছরের(১৯২১-১৯২৫)। কিন্তু এই চার বছরে 'দেশবন্ধুর' সাক্ষাৎ সান্নিধ্য সুভাষ চন্দ্রের 'দেশনায়ক' হয়ে গড়ে ওঠার সময় কাল বললে খুব অত্যুক্তি হবে না। একথা সত্য যে মানুষের জীবনে সর্বাপেক্ষা প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা আছে আদর্শের। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের ত্যাগ-তিতিক্ষা ময় জীবনে আদর্শের প্রভাব তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। নবজাগরিত বাংলার বৌদ্ধিক প্রবাহে রামকৃষ্ণ- বিবেকানন্দ ভাব তরঙ্গের মাত্রা নিরুপন যেমন দুঃসাধ্য ঠিক তেমনি জাতীয় জীবনের স্রোতধারায় এই ভাবপ্রবাহে অবগাহিত একদল দেশপ্রেমিকের জীবনের বহুমাত্রিকতা কে ভাষায় প্রকাশ করা বা লেখনীতে বেঁধে রাখার চেষ্টা বেশ দুঃসাধ্য। এ প্রসঙ্গের অবতারণা এই কারণেই যে শ্রীরামকৃষ্ণ - বিবেকানন্দের পবিত্র জীবন সুভাষচন্দ্র কে প্রভাবিত করেছিল একথা ঐতিহাসিক সত্য, কিন্তু দেশবন্ধুর জীবনে তিনি দেখেছিলেন সেই আদর্শের বাস্তবায়ন। প্রকৃতপক্ষে ঔপনিবেশিক ভারতের ইতিহাস তো শুধুমাত্র স্বায়ত্তশাসন অর্জনের উদ্দেশ্যে ভারতীয়দের রাজনৈতিক লড়াইয়ের ইতিহাস নয়, বরং এই ইতিহাস আদর্শের, ত্যাগের, সত্যনিষ্ঠার, অহংকার শূন্যতার। তাই হয়ত "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" - এক স্বতন্ত্র অধ্যায়।

দেশবন্ধুর রাজনীতি ও পরিচিতি:

সুভাষ চন্দ্রের সাথে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সাক্ষাৎ সম্পর্ক গড়ে ওঠার আগে দেশবন্ধুর যাপিত জীবনের সাথে পরিচিত হওয়া আবশ্যক। আইনের ছাত্র দেশবন্ধু ইংল্যান্ডে থাকাকালীন অবস্থায় হাউস অব কমন্সে দাদাভাই নওরোজির সদস্যপদ লাভের বিষয়ে জনমত সংগঠিত করেছিলেন। যদিও এরপরে দেশবন্ধু ভারতে ফিরে আসেন (১৮৯৪) এবং কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টার হিসাবে তার কর্মজীবন শুরু করেন।এইসময় বহু খ্যাতনামা বিপ্লবীদের আইনি সহায়তা প্রদানে দেশবন্ধুর বিশেষ ভূমিকা ছিল যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এর নাম। তবে আইনজীবী হিসাবে দেশবন্ধুর খ্যাতি শীর্ষে উঠেছিল ১৯০৮ এ আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দ ঘোষ এর পক্ষে সওয়াল জবাব করে। প্রকাশ্য কংগ্রেসি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ১৯১৭সালে। ১৯১৭ থেকে ১৯২৫এর মধ্যে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ১১টি সম্মেলনে এবং ৬টি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে চিত্তরঞ্জন দাশের উজ্জ্বল উপস্থিতি এবং স্বচ্ছ সিদ্ধান্ত উল্লেখের দাবি রাখে। ১৯১৭এর ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে দেশবন্ধুর সভাপতির ভাষণ দিশাহীন কংগ্রেসী আন্দোলনকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল। শুধু তাই নয় ১৯১৯

সালে সমস্ত বিরোধিতা কে উপেক্ষা করে ভারত সরকার 'Defence of India Act' এবং 'রাওলাট বিল' কে আইনে পরিণত করে। মহাত্মা গান্ধী এর বিরুদ্ধে ঘোষণা করেন সত্যাগ্রহ। এই সত্যাগ্রহ কে সমর্থন করে ৬ ই এপ্রিল কলকাতার গড়ের মাঠের মনুমেন্টের নিচে এক বিরাট প্রতিবাদ সভায় দেশবন্ধুর সত্যাগ্রহের শপথ তার সত্যনিষ্ঠার ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডে দেশ স্তম্ভিত হয়েছিল 'সভ্য জাতির অসভ্যতা' দেখে। রয়েল কমিশনের ভারতীয় দাবিকে নস্যাৎ করে হান্টার এর নেতৃত্বে ব্রিটিশ সরকার 'তদন্ত কমিটি' গঠন করলেও অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি গঠন করেছিল একটি সমান্তরাল অনুসন্ধান কমিটি।এই তদন্ত কমিটিতে স্থান পেয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, পন্ডিত মতিলাল নেহেরু, আব্বাস তায়েবজী প্রমুখরা। অসহযোগ আন্দোলনের নীতি নির্ধারণ কে কেন্দ্র করে মহাত্মা গান্ধীর সাথে দেশবন্ধুর মতান্তর ঘটেছিল মনান্তর নয়। যদিও ১৯২০ এর নাগপুর অধিবেশন অসহযোগ প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। দেশবন্ধু মূলত চেয়েছিলেন অসহযোগ কে একটি ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের চেহারা দিতে যেখানে 'স্বরাজ' একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে উঠে আসবে।

দেশবন্ধুর সংস্পর্শে সুভাষ:

সুভাষচন্দ্র বসু এই সময়ে ছিলেন লন্ডনে। ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে তার সজাগ দৃষ্টি ছিল।১৯২১ সালে সুভাষচন্দ্র জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করে দেশসেবাব্রতে অংশগ্রহনের ইচ্ছা প্রকাশ করে দেশবন্ধু কে দুটি পত্র লিখেছিলেন। ১৬/০২/১৯২১ তারিখে তার লেখা প্রথম পত্রে তিনি দেশবন্ধু কে উদ্দেশ্য করে লিখছেন-" ১৯২০ সালের আগস্ট মাসে আমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করি এবং চতুর্থ স্থান অধিকার করি।... সরকারি চাকুরী করিবার আমার মোটেই ইচ্ছা নাই।... আমি জানতে ইচ্ছা করি আপনারা আমাকে এই স্বদেশ সেবার যজ্ঞে কি কাজ দিতে পারেন।... আপনি বাংলাদেশে আমাদের সেবা যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক - তাই আপনার নিকট আমি আজ উপস্থিত হইয়াছি- আমার যৎসামান্য বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি ও উৎসাহ লইয়া। মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করিবার আমার বিশেষ কিছুই নাই- আছে শুধু নিজের মন এবং নিজের এই তুচ্ছ শরীর"। দেশে ফেরার আগে দেশবন্ধু কে উদ্দেশ্য করে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয় পত্র লেখেন ০২/০৩/১৯২১ তারিখে। পত্রটি মনোযোগ সহকারে অধ্যায়ন করলে দেখা যাবে সুভাষচন্দ্র খুব স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ পরিকল্পনা সহকারে দেশহিতব্রতে যোগদানে ইচ্ছুক। তার সমগ্র কর্মময় জীবনের এ এক অনবদ্য বৈশিষ্ট্য- স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ চিন্তা ও তার বাস্তবায়ন। এই পত্রে তিনি জাতীয় কংগ্রেস সংক্রান্ত বেশ কিছু মূল্যবান প্রস্তাব রেখেছিলেন। সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধু কে উদ্দেশ্য করে লিখছেন -"স্বদেশসেবার যে মহাযজ্ঞের আয়োজন হচ্ছে আপনি তাহাতে বঙ্গদেশের প্রধান পুরোহিত।... এখন আপনি আমাকে আপনার বিপুল কাজের মধ্যে স্থান দিন"। লক্ষণীয় বিষয় দেশ বন্ধুর প্রতি কী বিপুল শ্রদ্ধা ইতিমধ্যেই সুভাষচন্দ্রের হৃদয়ে গ্রথীত হয়েছে। ১৯২১ সালের ১৬ ই জুলাই দেশে ফিরে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুকে গুরুর পদে বসালেন। খুব

নিকটে থেকে লক্ষ্য করলেন উচ্চ আদর্শে যাপিত এক জীবনকে। এসময় সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন - "Reaching Calcutta I went straight to the house of Deshabandhu Das...By the time our conversation came to end, my mind was made up. I felt that I had found a leader..."।দেশবন্ধুর সহধর্মিনীকে সুভাষচন্দ্র 'মা' বলে সম্মোধন করে দেশ ও জনগনের সেবায় মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন।

রাজনৈতিক গুরু পদে বরণ ও যৌথ আন্দোলনে যোগদান:

নাগপুর কংগ্রেস থেকে কলকাতায় ফিরে দেশবন্ধুর জীবনে ঘটল আমূল পরিবর্তন। ত্যাগ করলেন তার আইন ব্যবসা, ত্যাগ করলেন তার চিরাচরিত সব অভ্যাস। হরিশ মুখার্জি পার্কের সভায় দেশবন্ধু দেশবাসীকে বললেন- "আজ থেকে আমার ঐহিক সম্পদ, আমার বিলাসিতা সবই দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গ করলাম"- এ শুধু মুখের কথা নয়, দেশবন্ধু হয়ে উঠলেন ত্যাগের মূর্ত প্রতীক। এই সমস্ত কিছু লক্ষ্য করলেন সুভাষচন্দ্র। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে বিদেশি বস্ত্র বর্জন আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। দেশবন্ধুর কন্যা অপর্ণা দেবী লিখছেন-" বিরাট বস্ত্র যজ্ঞকুণ্ডের পাশে তার প্রধান হোতারূপে সুভাষচন্দ্র আসীন, এ দৃশ্য ভুলবার নয়"। ১৯২১ এর ১০ই ডিসেম্বর অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এর মত ব্যক্তিত্বরা গ্রেপ্তার হন। আগেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন দেশবন্ধুর পুত্র চিররঞ্জন। কারাবাসের এই সময়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে ২০/০২/১৯২৬ তারিখে দেশবন্ধুর জীবনচরিত লেখক শ্রী হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন- "১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে আমি মাত্র ৩/৪মাস কাল তাহার অধীনে কাজ করেছিলাম। সুতরাং সেই সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে তাহাকে ভালোরকম বুঝিবার সুবিধা আমার হয় নাই। তারপর যখন আট মাস কাল একত্র বাস করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য ঘটিল তখন খাঁটি মানুষকে আমি চিনিতে পারিলাম"। এই পত্রেই সুভাষচন্দ্র যে দৃষ্টিতে দেশবন্ধু কে দেখেছেন তার এক অনন্য অসাধারণ বর্ণনা তুলে ধরেছেন। দেশবন্ধুর উদারতা, ধৈর্য, মহাপ্রাণতা, উদার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, গভীর অধ্যায়ন ক্ষমতা, অনন্য রসবোধ তরুণ সুভাষের হৃদয়কে প্রতি পদক্ষেপে অনুপ্রাণিত করেছে - এ স্বীকারোক্তি সুভাষচন্দ্রেরই।

১৯২২ এর ৯ ই আগস্ট দেশবন্ধুর কারামুক্তি ঘটে। ইতিপূর্বে কারাগারে থাকা কালিন অবস্থায় কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯২২ এর গয়া কংগ্রেসেও দেশবন্ধু সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন পরবর্তী কংগ্রেসী আন্দোলনের পথ নিয়ে মতবিরোধের কারণে তিনি এবং মতিলাল নেহেরুর উদ্যোগে কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই গঠন করেছিলেন 'কংগ্রেস খিলাফত স্বরাজ্য পার্টি'। নির্বাচনের মাধ্যমে কাউন্সিলে প্রবেশ করে সরকারি কাজে অসহযোগিতাই এই দলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচনে স্বরাজ্য দলের প্রার্থীদের বিপুল জয় হয়েছিল। 'কলকাতা মিউনিসিপাল অ্যাক্ট' অনুযায়ী ১৯২৪এর এপ্রিলে

কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন দেশবন্ধু। তার প্রিয়তম সহকর্মী সুভাষচন্দ্র কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তার পদ (Chief Executive) পদ লাভ করেছিলেন। দারিদ্র দূরীকরণ, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, স্বল্পমূল্যে দুধ সরবরাহ, চিকিৎসা, বস্তি উন্নয়ন, অবৈতনিক পাঠ দান প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেশবন্ধুর সহকারি হিসেবে সুভাষ চন্দ্রের উদ্যোগ বিশেষ উল্লেখের। নাগরিকদের উৎসাহ ও আত্মচেতনার উদ্বোধনে সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে প্রকাশিত হতে থাকে 'কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেট'।

দেশবন্ধুর আদর্শে দেশনায়কের যাত্রা:

তবে ১৯১৭-১৯২৫সময় পর্বের অক্লান্ত পরিশ্রমের কারনেই হয়তো ১৯২৫এর ১৬ই জুন দেশবন্ধু 'চির বিশ্রামের দেশে' যাত্রা করলেন। তবে তিনি রেখে গেলেন সুভাষচন্দ্র কে। সুভাষ চন্দ্রের পরবর্তী জীবন যেন দেশবন্ধুর আদর্শেই উৎসর্গীকৃত। ছেলেবেলা থেকে বিবেকানন্দের আদর্শে বিশ্বাসী সুভাষচন্দ্র 'আদর্শের প্রয়োগ' কে খুঁজে পেয়েছিলেন দেশবন্ধুর মধ্যে। দেশবন্ধুর প্রয়ানের পরের বছর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে সুভাষচন্দ্র লিখছেন - "সমুদ্রে প্রকাণ্ড ঘূর্ণাবর্তের ন্যায় এই বিপুল জনসমাজে তিনি চারিদিক হইতে সকল প্রাণকে আকর্ষণ করিতেন।... যাহারা তাহার পাণ্ডিত্যের নিকট মাথা নত করেন নাই, অসাধারণ বাগ্মিতায় বশীভূত হয়েন নাই, বিক্রমের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন নাই, অলৌকিক ত্যাগে মুগ্ধ হয়েন নাই, তাহারা পর্যন্ত ওই বিশাল হৃদয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন"। প্রকৃতপক্ষে দেশবন্ধুর প্রতি সুভাষচন্দ্রের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও আনুগত্য ইতিহাসের স্বতন্ত্র অধ্যায় তবে এই আনুগত্যকে কখনোই 'প্রশ্নাতীত' আনুগত্যে পৌঁছাতে দেননি দেশবন্ধু। সুভাষচন্দ্র তার বিভিন্ন পত্রে লিখেছেন কিভাবে দেশবন্ধু সমস্ত বিরুদ্ধমত কে গুরুত্ব দিতেন, বিচার করতেন, শুনতেন। সুভাষচন্দ্র লিখছেন- "তিনি(দেশবন্ধু) বাস্তবজীবন ও আদর্শের মধ্যে একটা মধুর সামঞ্জস্য স্থাপন করেছিলেন"। সুভাষচন্দ্রের পরবর্তী জীবনেও আমরা লক্ষ্য করবো তিনি কখনও কঠিন বাস্তবতার সাথে আদর্শের অসামঞ্জস্যতা ঘটতে দেননি। সবশেষে এটাই বলার 'দেশবন্ধু' ও 'দেশনায়কের' সম্পর্কের রসায়ন কে লেখনীতে বদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়তো বা ধৃষ্টতা। কারণ এ যোগাযোগ শুধু রাজনীতির নয়, এ যোগাযোগ আত্মার, আত্মীয়তার, শ্রদ্ধার, আদর্শের। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে বিশ্বকবি তার শ্রদ্ধাঞ্জলিতে বলেছিলেন- "এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ

মরনে তাহাই তুমি করে গেলে দান"।

হয়তো ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বিশ্বকবির এ এক আশ্চর্য ভবিষ্যৎবাণী! হ্যাঁ দেশবন্ধু দিয়ে গিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র কে, এক 'মৃত্যুহীন প্রাণ' কে। বাংলা তথা ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষ করেছিল 'দেশবন্ধুর' প্রস্থানে 'দেশনায়ক' এর আবির্ভাব।

সুভাষচন্দ্রের লেখনী ও বাংলা সাহিত্য

শ্রী শুভাশিষ পাল, শিক্ষক বাংলা বিভাগ,
ভক্তিবেদান্ত ন্যাশনাল স্কুল, মায়াপুর।

'যুগের না হই হুজুগের কবি'—স্বয়ং কাজী নজরুল ইসলাম 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় এমন কৈফিয়ৎ-ই দিয়েছিলেন --- তাঁর লেখনীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের ভিত্তিতে। অভিযোগ এই যে তাঁর কাব্যে 'বিদ্রোহ রস' যত আছে 'সাহিত্যরস' তত নেই।এই 'হুজুগ' আসলে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের তাড়না। তিনি নির্দ্বিধায় বলেছিলেন তাঁর কলম ধরার উদ্দেশ্য নিজেকে কালোত্তীর্ণ সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে নয়, পরাধীন ভারতের কান্নাকে বিদ্রোহ রূপান্তরিত করার উদ্দেশে। একথা স্বীকার্য যে বাংলা সাহিত্যের রসধারায় তাঁর স্থান স্বর্ণাক্ষরে লিখিত।

সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কেও একথা সমানভাবে সত্য। নজরুলের মত তাঁর লেখা গদ্যে সংগ্রামের দীপ্ত মানসিকতা ফুটে উঠেছে--- একইসঙ্গে ফুটে উঠেছে অনাবিল সাহিত্যরস। তবুও বাংলা সাহিত্যে গদ্যের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্রের নাম কান পাতলেও শোনা যায় না। কারণ হিসেবে বলা যায় তিনি তেমনভাবে সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন নি এবং 'তরুণের স্বপ্ন' ব্যতিরেকে তেমন প্রকাশিত গ্রন্থ নেই। কিন্তু যা আছে তা হল অসংখ্য পত্র, অভিভাষণ এবং পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ। তাঁর লেখা প্রবন্ধগ্রন্থ গুলি হল- 'ভারতপথিক'(অসমাপ্ত আত্মজীবনী) 'তরুণের স্বপ্ন', 'নতুনের সন্ধান'। এছাড়াও 'দেশের ডাক', 'দেশবন্ধু স্মৃতি', 'আমরা কি চাই', 'গোড়ার কথা' ইত্যাদি। এগুলোও পরবর্তীকালে 'তরুণের স্বপ্ন' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁর এই সমস্ত লেখনীতে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দের ন্যায় দৃঢ় প্রত্যয়ী যৌক্তিক পারম্পর্যে পূর্ণ গদ্য ভাষার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

তাঁর যে অসংখ্য পত্রাবলী রয়েছে তা কোনো ব্যাক্তিসংকীর্ণতার স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে নি, সমকালীন সমাজ- রাজনীতি তার পরতে পরতে ছুঁয়ে আছে। একইসাথে তা ব্যতিক্রমী শিল্পনির্মাণও বটে। ব্যতিক্রমী এই কারণে যে, এর মধ্যে আছে আঙ্গিকের অভিনবত্ব-- সহজ সুরের আলাপী ভঙ্গি দীপ্ত মানসিক শৌর্যে পর্যবসিত হয়েছে। ভাষার ক্ষেত্রে তিনি কখনো চলিত রীতির আশ্রয়ী কখনো সাধু ভাষাকে আপন করেছেন। সাধু ভাষার প্রয়োগেও প্রাঞ্জলতার অন্তরায় কখনো হয়ে ওঠে নি। মাতৃদেবীকে পত্রে তিনি লিখছেন-''আমাদের সমাজের ইতিহাসে যখনই বিপদ আপদ জুটিয়াছে তখনই মা-র আবাহন আমরা রচনা করিয়াছি। ...'বন্দেমাতরম' গান লইয়া আমাদের জাতীয় অভিযান সুরু হইয়াছে। তাই আজ এমনভাবে মা-কে ডাকিতেছি ---কিন্তু পাষাণীর হৃদয় কি গলিবে না?''

শুধু তাই নয়, সুভাষ-মানসের বৈচিত্র্যময়তায় ভাস্বর পত্রগুলি। বন্ধুবর দিলীপ কুমার রায়কে লেখা চিঠিতে যেমন অন্তরঙ্গতার সুর ধ্বনিত হয়েছে তেমন রয়েছে জেলের পরিবেশ নিয়ে মননশীল ভাবনা-"জেলখানার সমস্ত আবহাওয়াটা মানুষকে যেন বিকৃত ও অমানুষ

করে তোলারই উপযোগী এবং আমার বিশ্বাস একথাটা সকল জেলের পক্ষেই খাটে। একথা আমাকে বলতেই হবে যে এতদিন জেলে বাস করার পর কারা শাসনের একটা আমূল সংস্কারের একান্ত প্রয়োজনের দিকে আমার চোখ খুলে গেছে এবং ভবিষ্যতে কারা সংস্কার আমার একটা কর্তব্য হবে"। পত্রে উঠে আসছে জাতি নিয়ে নানান ভাবনা-"নানা কারণে আমাদের জাতির কর্মের দিকটা শূন্য হয়ে এসেছে, তাই এখন আমাদের দরকার রজোগুণের double dose"।

তাঁর রোমান্টিক প্রকৃতিপ্রেমিক মনও ধরা দিয়েছে পত্রের পাতায়। মেজদাদাকে একটি পত্রে লিখছেন — "যাহারা কখনো সমুদ্রে যায় নাই, তাহারা সত্যই বঞ্চিত—ইহা এমনই সুন্দর। অস্তগামী সূর্যের আভায় সীমাহীন সমুদ্র উদ্ভাসিত প্লাবিত, তরঙ্গরাশির সহিত আলোকের ওঠাপড়ার খেলা!"।

নারীর প্রেমের হাতছানিও তাঁর জীবনস্রোতে বয়েছিল। অষ্ট্রিয়ান নারীকে তাঁর চিঠিতে উঠে এসেছে এক চিরন্তন প্রেমের পরাকাষ্ঠা—" এই মুহূর্তে আমাদের দুই দেশের মধ্যে যেসব পার্থক্য আছে সবই আমি ভুলে গিয়েছি আমি ভালোবেসেছি তোমার ভিতরে যে নারী আছে, যে অন্তরাত্মা আছে তাকে"।

এ কেবল দু'চারটি নয় প্রতিটি পত্রের ছত্রে ছত্রে উঠে এসেছে সমাজ-পরিবেশ, সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে সজীব ভাবনা।

তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থগুলিতেও চিত্রিত হয়েছে সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তা। সহজ-সাবলীল ভাষায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এমন নিপুণ বিশ্লেষণ গদ্যসাহিত্যে বিরল। তাঁর আত্মজীবনী 'ভারতপথিক'-এ ব্যক্তিক আত্মোন্মচনের সাথে সাথে রূপায়িত হয়েছে সমাজ সম্পর্কে নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি। আপন জীবন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শিশু মনস্তত্ত্ব নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন-- "শিশু খেতে না চাইলে তাকে জোর করে খাওয়াবার জন্য যেসব কথা বলে তাকে ভোলান হয় প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় এসব এর একমাত্র উদ্দেশ্য শিশুকে ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করা। বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ঘুমপাড়ানি গান হল- 'ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি বর্গী এলো দেশে...।' অভিযানের কাহিনী শিশুদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে এবং তার ফলে ভালো হতে পারে না সে কথা বলাই বাহুল্য"। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে নিখিল বলেছেন- আমার ভারতবর্ষ কেবল ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ নয়। আমি জানি আমার নীচের যত লোক নাবছে ভারতবর্ষই নাবছে, তারা যত মরছে ভারতবর্ষই মরছে"। কটকের প্রত্যন্ত গ্রামে প্লেগ রোগীর সেবা করতে তিনি সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের এই রূপই প্রত্যক্ষ করছেন – "...এক সপ্তাহে আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম তাতে ভারতের সত্যিকার রূপটি আমার চোখে ধরা পড়েছিল যে, ভারতের গ্রামে গ্রামে শুধু নিদারুণ দারিদ্র্য, মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা আর নিরক্ষরতার অভিশাপ"।হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে তিনি অকপট – "আজকাল হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক বিভেদের কথা প্রায়ই প্রচার করা হয় সেটা নেহাৎই কৃত্রিম, অনেকটা আয়র্ল্যান্ডের ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যাণ্ট বিরোধের মতো—এবং এর জন্য যে আমাদের বর্তমান শাসকেরাই বহুল

পরিমাণে দায়ী সেকথা অস্বীকার করবার উপায় নেই”।

তাঁর প্রধান প্রবন্ধগ্রন্থ 'তরুণের স্বপ্ন' যুবকদের চিরকালীন জীবনবেদ। একইসাথে সামাজিক-রাজনৈতিক উপলব্ধিও চিরন্তন রূপ লাভ করেছে- “আজ বাংলার সর্বত্র কেবল ক্ষমতার জন্য কাড়াকাড়ি চলিতেছে। যার ক্ষমতা আছে—সে ক্ষমতা বজায় রাখিতেই ব্যস্ত। যার ক্ষমতা নাই সে ক্ষমতা কাড়িবার জন্য বদ্ধপরিকর। উভয়পক্ষই বলিতেছে, দেশোদ্ধার য যদি হয় তবে আমার দ্বারাই হউক, নয় তো হইয়া কাজ নাই”।

সুভাষচন্দ্রের গদ্য তাঁর হৃদয় নিংড়ানো, সমাজ-রাষ্ট্রনৈতিক অভিজ্ঞতার নির্যাস। তা যে বাংলা সাহিত্যর চিরকালীন সম্পদ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ক্যুইজ

সৌরভ স্বর্ণকার, তৃতীয় সেমিস্টার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

১) খুদে জেলা শাসক কাকে বলা হয়?

ক) BDO

খ) SDO

গ) CDPO

২) PC সরকারের পুরো নাম কি?

ক) প্রতুল চন্দ্র সরকার

খ) প্রিয়তোষ বাগজী

গ) প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার।

৩) কলকাতার মুখ্যমন্ত্রী বলা হয় কাকে?

ক) ডেপুটি মেয়র

.খ) মেয়র

গ) কাউন্সিলর।

৪) পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র মহাকুমা পরিষদ আছে?

ক) ব্যারাকপুর মহাকুমা পরিষদ

খ) দার্জিলিং মহাকুমা পরিষদ

গ) শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ।

৫) কোন দিনটিকে চিকিৎসক দিবস হিসেবে পালন করা হয়?

ক) ১লা জুলাই

খ) ১লা জুন

গ) ১লা ফেব্রুয়ারি

৬) "দিদিকে বল" প্রকল্পের নাম্বার কোনটি?

ক) ৫৫০

খ) ৫২০ ৫২০

গ) ৯১৩৭০ ৯১৩৭০

৭) বিধানসভার জনপ্রতিনিধিদের কি নামে ডাকা হয়?

ক) MP

খ) MLA

গ) MD

৮) পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় মহাকুমার নাম কি?

ক) হুগলি মহাকুমা

খ) ব্যারাকপুর মহাকুমা

গ) খড়গপুরর মহকুমা।

৯) জাপানের ক্যাপিটাল সিটি কোনটি?

ক) বেজিং

খ) হংকং

গ) টোকিও

১০) পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় পাখির নাম কি?

ক) চড়ুই

খ) মাছরাঙ্গা

গ) বাবুই

১১) Biology কথার প্রবর্তন করেন কে?

ক) ডারউইন

খ) ল্যামার্ক

গ) মেন্ডেল

১২) কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের নেতা কি নামে পরিচিত?

ক) প্রধানমন্ত্রী

খ) ক্যাবিনেট সচিব

গ) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

১৩) ভারতীয় সংবিধানের ব্যাখ্যা কর্তা কে?

ক) লোকসভা

খ) রাজ্যসভা

গ) সুপ্রিম কোর্ট

১৪) পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় বৃক্ষের নাম কি?

ক) মহুয়া

খ) ছাতিম

গ) সুন্দরী

১৫) ভারতের কোন যুদ্ধে প্রথম 'কামানের' ব্যবহার শুরু হয়?

ক) পানিপথের প্রথম যুদ্ধ

খ) সিপাহী বিদ্রোহে

গ) জুনাগড় এর যুদ্ধে।

১৬) 'আলমগীর' উপাধি কে নিয়েছিলেন?

ক) সাজাহান

খ) ঔরঙ্গজেব

গ) আকবর

১৭) HIV - কি ধরনের রোগ ?

-ক) DNA ভাইরাস

খ) RNA ভাইরাস ঘটিত

গ) প্যারাসাইট ঘঠিত।

১৮) কোন প্রাণী কোনদিন ঘুমায় না?

ক) মাকড়সা

খ) পিঁপড়ে

গ) আরশোলা।

১৯) বাংলাদেশের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তৈরি প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের নাম কি?

ক) মুক্তিযোদ্ধা -১

খ) বঙ্গবন্ধু -১

গ) সোনার বাংলা -১ ।

২০) 'ত্রিপিটক' কোন ভাষায় রচিত?

ক) ব্রাম্ভি

খ) পালি গ) সংস্কৃত।

পুস্তক পর্যালোচনাঃ

ভারতীয় সংবিধান ও রাজনীতি

রাজীব শ্রাবণ, ছায়া প্রকাশনী

মার্চ, 2020 সংস্করণ

ISBN 978-93-89227-45-1

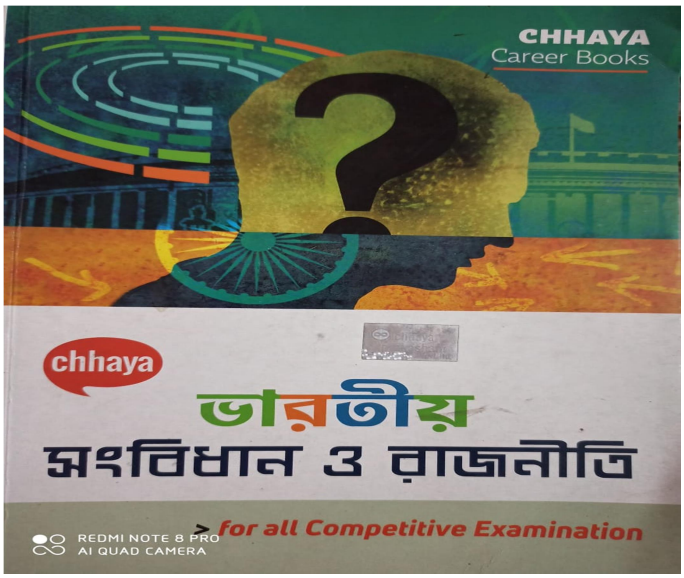

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়েও যারা স্নাতক স্তরে পড়াশোনা করছেন তাদের যেকোন ধরনের চাকরির পরীক্ষা দিতে গেলে 'ভারতীয় সংবিধান ও রাজনীতি' বিষয়ে কিছু প্রাথমিক ধারণা থাকা দরকার হয়। শুধু তাই নয় দেশের একজন সুস্থ নাগরিক হিসেবে দেশের সংবিধান, আইন, সরকার পরিচালনা, নির্বাচন, নাগরিক অধিকার, বিভিন্ন কমিটি, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে কিছু ধারণা থাকাটা অবশ্যই প্রয়োজন।

এ সমস্ত বিষয়ে ইংরেজি মাধ্যমে গুণমানের বিচারে কিছু ভালো বই থাকলেও বাংলা ভাষায় এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য যে সমস্ত প্রশ্ন আসে সেই প্রয়োজনে সেরূপ কোন বইয়ের বিশেষ অভাব ছিল। কিন্তু 'ভারতীয় সংবিধান ও রাজনীতি' (রাজীব শ্রাবণ রচিত, ছায়া প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত) অত্যন্ত আপডেটেড এবং প্রত্যেকটি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার উপযোগী করে ব্যাখ্যা করা রয়েছে। সাংগঠনিক এবং সাংবিধানিক বিষয়গুলি ছাড়াও সাম্প্রতিক কালের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইন, কিছু চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বা ভারতীয় রাজনীতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক খুব সুন্দর ভাবে এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সর্বোপরি বিকল্প ভিত্তিক প্রশ্ন বা MCQ প্রশ্ন সহ উত্তর শিক্ষার্থীদের বিশেষ কাজে আসবে । যারা কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি বা পশ্চিমবঙ্গের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রস্তুতি নিচ্ছে তাদের জন্য এটি অত্যন্ত আবশ্যক। এছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) যারা পাঠরত তাদের দ্বিতীয় সেমিস্টারের জন্য বইটির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সংবিধান এবং রাজনীতির বিষয়ে এই বইটি উপযোগী।

বিভাগীয় উদ্যোগ

বিভাগীয় সেমিনারঃ

Schedule of Student's Seminar (2021- 2022) - 5th Semester

Organised by:

Department of Political Science, Karimpur Pannadevi College.

Sl No:-	Date		Name	Topic for Presentation
1	07/12/2021	i	ASOM REJA	স্বাধীনতার পরবর্তীতে শিল্প ক্ষেত্রে উন্নয়নের নীতি।
		ii	ASMINA KHATUN	প্লেটোর ন্যায়তত্ত্ব।
2	09/12/2021	i	SUVOMOY MONDAL	প্লেটোর সাম্যবাদ।
		ii	MILINA KHATUN	রুশোর সাধারণ ইচ্ছার তত্ত্ব ও গণতন্ত্র।
3	11/12/2021	i	BAPAN SHAH	জন লকের রাষ্ট্রচিন্তা।
		ii	INJABUL HOQUE	ভারতের নারী আন্দোলন।
4	13/12/2021	i	PREMOMOY SHARMA	ম্যাকিয়াভেলি এবং ক্ষমতার রাজনীতি।
		ii	PRITAM MONDAL	রুশোর সাধারণ ইচ্ছার তত্ত্ব গণতন্ত্র।
5	15/12/2021	I	SOUVIK GHOSH	জন লকের রাষ্ট্রচিন্তা।
		ii	MANIRUL SARDAR	অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্র ও সংবিধানের শ্রেণীবিন্যাস।
6	17/12/2021	i	BITTU GHOSH	রুশোর সাধারণ ইচ্ছার তত্ত্ব গণতন্ত্র।
		ii	FIROJA KHATUN	ভারতে জননীতি রূপায়নের প্রতিবন্ধকতার দিকে আলোকপাত করো।
7	18/12/2021	i	SUSMITA ROY	ভারতের নারী আন্দোলন।
		ii	BARSHA KHATUN	টমাস হবসের সার্বভৌমিকতার ধারণা এবং মানব প্রকৃতি সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি।
8	20/12/2021	i	RAJESH SHAIKH	গ্রিক রাষ্ট্রচিন্তা।
		ii	LABONI HALDER	সবুজ বিপ্লব ও বিশ্বায়নের পরবর্তীতে কৃষক সংকট।
9	21/12/2021	I	BARSHA KHATUN	হবস এবং লকের মানব প্রকৃতি তথা রাষ্ট্রচিন্তার তুলনামূলক আলোচনা।
		ii	RICHA SHARMA	মধ্যযুগের ধর্ম সংস্কার আন্দোলনে জণ ক্যালভিন এর অবদান।
10	23/12/2021	i	ASOM REJA	ভারতে শিক্ষা, পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যের জননীতি গুলি আলোচনা করো।
		ii	RUMANA SULTANA	অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্র ও সংবিধানের শ্রেণীবিন্যাস।

**Seminar presentation will carry marks.

**Due to some unavoidable circumstances the above schedule may be changed.

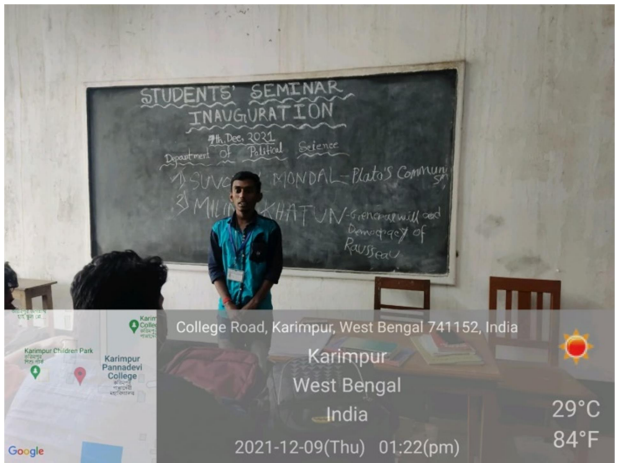

বিভাগ আয়োজিত স্টুডেন্ট সেমিনার এর কিছু ছবি। মূলত: পঞ্চম সেমিস্টারের (2021-2022) শিক্ষার্থীরাই এর মূল উদ্যোক্তা। সেমিনারের সম্পূর্ণ সিডিউল যুক্ত করা হলো।

কৃতিত্ব বা বিশেষ পুরষ্কার অর্জন:

বিগত ১৮ই জানুয়ারি এবং ২০ শে জানুয়ারি ২০২২ ব্লক এবং নদিয়া জেলা নির্বাচন আইয়ুব আয়োজিত প্রবন্ধ এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিভাগের শিক্ষার্থীরা বিশেষ সাফল্য লাভ করে। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ব্লক স্তরে প্রথম স্থান অধিকার করে অনন্যা পাল, তৃতীয় সেমিস্টার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সাম্মানিক এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রথম এবং জেলাস্তরে প্রথম স্থান অধিকার করে রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন বর্ষা খাতুন, পঞ্চম সেমিস্টার ,রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সাম্মানিক। প্রশাসনিক স্তর চিঠি এর সঙ্গে যুক্ত করা হলো।

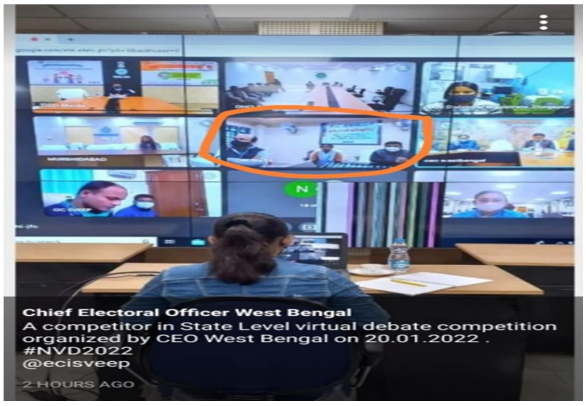

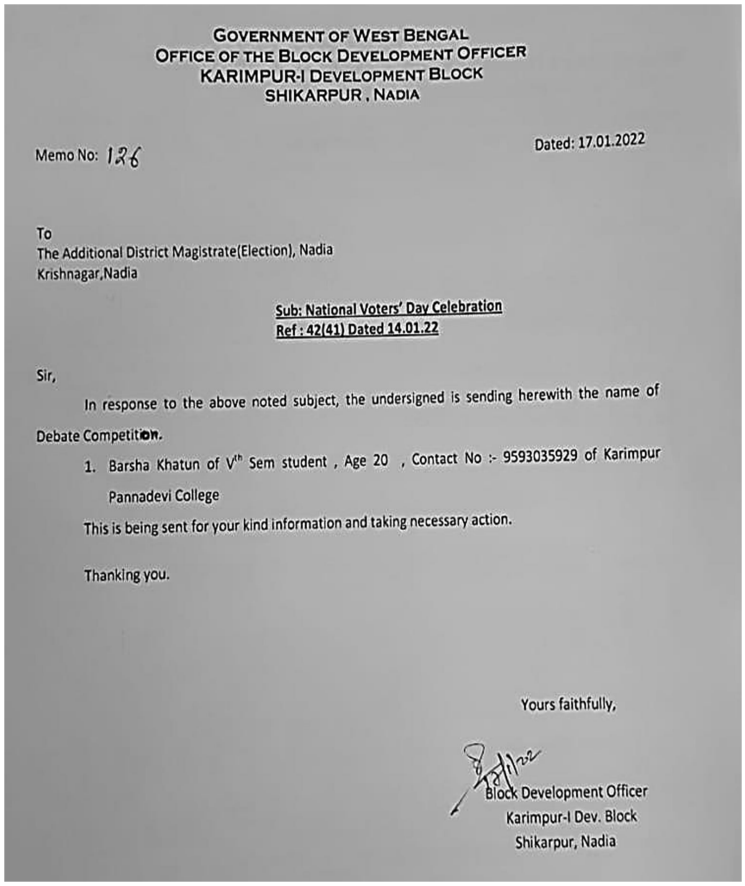

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
KARIMPUR-I DEVELOPMENT BLOCK
SHIKARPUR , NADIA

Memo No: 126 Dated: 17.01.2022

To
The Additional District Magistrate(Election), Nadia
Krishnagar,Nadia

Sub: National Voters' Day Celebration
Ref : 42(41) Dated 14.01.22

Sir,

In response to the above noted subject, the undersigned is sending herewith the name of Debate Competition.

1. Barsha Khatun of V[th] Sem student , Age 20 , Contact No :- 9593035929 of Karimpur Pannadevi College

This is being sent for your kind information and taking necessary action.

Thanking you.

Yours faithfully,

Block Development Officer
Karimpur-I Dev. Block
Shikarpur, Nadia

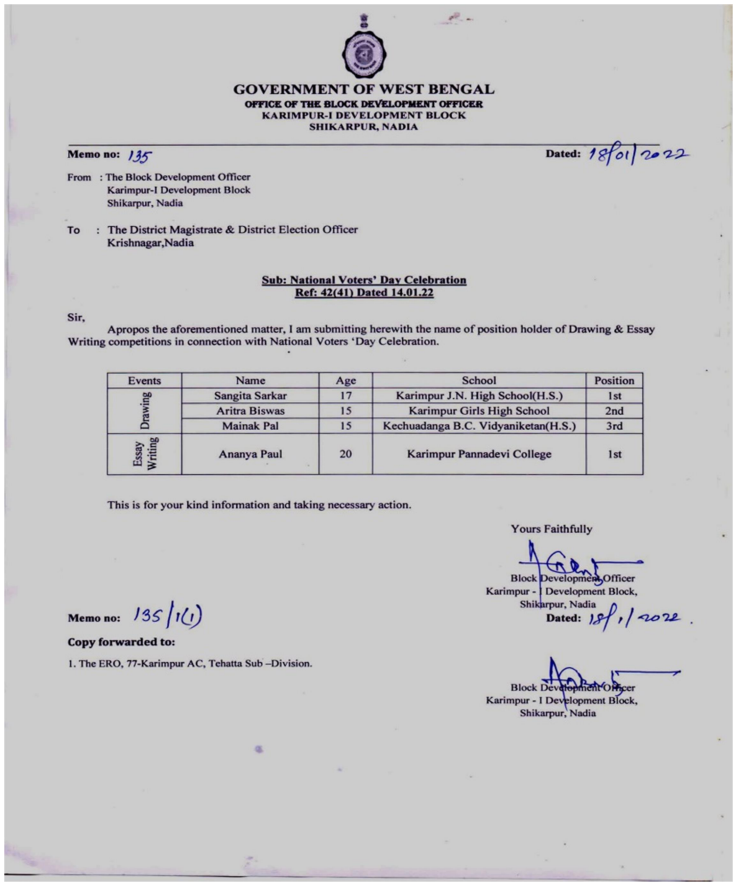

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
KARIMPUR-I DEVELOPMENT BLOCK
SHIKARPUR, NADIA

Memo no: 135 Dated: 18/01/2022

From : The Block Development Officer
Karimpur-I Development Block
Shikarpur, Nadia

To : The District Magistrate & District Election Officer
Krishnagar,Nadia

Sub: National Voters' Day Celebration
Ref: 42(41) Dated 14.01.22

Sir,

Apropos the aforementioned matter, I am submitting herewith the name of position holder of Drawing & Essay Writing competitions in connection with National Voters 'Day Celebration.

Events	Name	Age	School	Position
Drawing	Sangita Sarkar	17	Karimpur J.N. High School(H.S.)	1st
	Aritra Biswas	15	Karimpur Girls High School	2nd
	Mainak Pal	15	Kechuadanga B.C. Vidyaniketan(H.S.)	3rd
Essay Writing	Ananya Paul	20	Karimpur Pannadevi College	1st

This is for your kind information and taking necessary action.

Yours Faithfully

Block Development Officer
Karimpur - I Development Block,
Shikarpur, Nadia

Memo no: 135/1(1) Dated: 18/1/2022

Copy forwarded to:

1. The ERO, 77-Karimpur AC, Tehatta Sub –Division.

Block Development Officer
Karimpur - I Development Block,
Shikarpur, Nadia

****

সমীক্ষার বিবরণঃ

ষষ্ঠ সেমিস্টারের শিক্ষার্থীরা এ বছর তাদের বিশেষ একটি পত্রের (যা তাদের কোর্স এর অঙ্গীভূত ছিল।) তার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা সংগঠিত করেছিল। শিক্ষার্থীদের বিষয় এবং তাদের কাজের এলাকার একটি বিবরণ তুলে ধরা হলো।

Karimpur Pannadevi College
Estd.- 1968
P.O.- Karimpur, Dist.- Nadia, Pin- 741152, W.B.
E-mail ID : pannadevi_college@rediffmail.com
Website : Karimpurpannadevicollege.ac.in
Ph.- (03471) 255 158, Fax- (03471) 255 158

Ref. No. .... *Date* ....

From, The Principal / Teacher in - Charge / Secretary

To Whom It May Concern

Reference No PLSC/6th_semester/02/2020-2021 09.07.2021

To Whom It May Concern

This is to certify that the following students of the Department of Political Science of Karimpur Pannadevi College, Karimpur, Nadia are pursuing their 6th semester Honours course in Political Science under the University of Kalyani, Nadia, West Bengal. As a part of their course of study, they have to prepare their dissertation under the supervision of Dr. Prasenjit Saha(Assistant Professor, Department of Political Science) by going through a Case study method and for which they have desperately needed some field investigation in certain areas to collect the opinion of the people and other officials related with their respective topics of research. They will be immensely benefitted in their Research work if generous academic supports are available from all concern.

I wish them all success in life.

Group-B

Name of Students-	Topic of Research
1. Tahidul Shaikh	Rural Development Projects and People Awareness
2. Alamin Shaikh	Environmental Awareness of Rural People
3. Samim Mondal	MGNREGA and Role of Women in West Bengal
4. Mampi Mondal	Kanyashree and Women Education
5. Susmita Mondal	Children Education in Pandemic situation

(Kaustav Bhattacharyya)
Teacher-In-Charge
Karimpur Pannadevi College
P.O.Karimpur,Dist. Nadia

Karimpur Pannadevi College

Estd – 1968

P.O.-Karimpur, Dist- Nadia, Pin-741152, W.B.

Email ID: pannadevi_college@rediffmail.com , pannadevicollege@gmail.com Website : http://www.karimpurpannadevicollege.ac.in Ph.- (03471) 255 158, Fax- (03471) 255 158

Reference No PLSC/6th_semester/04/2020-2021

From The Principal / Teacher in - Charge / Secretary *Date:* 09/07/2021

To Whom It May concern

This is to certify that the following students of the Department of Political Science of Karimpur Pannadevi College, Karimpur, Nadia are pursuing their 6th semester Honours course in Political Science under the University of Kalyani, Nadia, West Bengal. As a part of their course of study, they have to prepare their dissertation under the supervision of Dr. Prasenjit Saha (Assistant Professor, Department of Political Science) by going through a Case study method and for which they have desperately needed some field investigation in certain areas to collect the opinion of the people and other officials related with their respective topics of research. They will be immensely benefitted in their Research work if generous academic supports are available from all concern. I wish them all success in life.

Group-D

Name of Students-	Topic of Research
1. Soumyadip Karmakar	Covid 19 and Transport Workers
2. Bikram Halder	Lockdown and Children Education in rural Areas
3. Rona Biswas	Role of ASHA Workers in Rural areas
4. Rahul Bhattacharjee	Migrant Workers and Covid 19
5. Supriya Mandal	Women Empowerment and Self help groups
6. Rakhi Das Bairagya	Rail Way for Krishnagar to Karimpur: Major Issues
7. Dipankar Swarnakar	Political Awareness of Rural West Bengal

Teacher-In-Charge
Karimpur Pannadevi College
P.O.Karimpur,Dist. Nadia

Kaustav Bhattacharyya
Teacher-in-charge, Karimpur Pannadvi college

Karimpur Pannadevi College

Estd.- 1968

P.O.- Karimpur, Dist.- Nadia, Pin- 741152, W.B.

E-mail ID : pannadevi_college@rediffmail.com

Website : Karimpurpannadevicollege.ac.in

Ph.- (03471) 255 158, Fax- (03471) 255 158

Ref. No. ..... *Date* .....

From, The Principal / Teacher in - Charge / Secretary

Reference No PLSC/6th_semester/01/2021 09/07/2021

To Whom It May Concern

This is to certify that the following students of the Department of Political Science of Karimpur Pannadevi College, Karimpur, Nadia are pursuing their 6th semester Honours course in Political Science under the University of Kalyani, Nadia, West Bengal. As a part of their course of study, they have to prepare their dissertation under the supervision of Dr. Prasenjit Saha(Assistant Professor, Department of Political Science) by going through a Case study method and for which they have desperately needed some field investigation in certain areas to collect the opinion of the people and other officials related with their respective topics of research. They will be immensely benefitted in their Research work if generous academic supports are available from all concern.

I wish them all success in life.

Group-A

Name of Students-	Topic of Research
1. Sanju Mandal	Child Marriage in Rural West Bengal
2. Sujay Mandal	Political Awareness of Rural Women
3. Juktalekha Roy	Educational Development of Women in Rural West Bengal
4. Moli Das Bairagya	Violence against Women and Safety in Rural West Bengal
5. Barsha Biswas	Health Awareness in Rural Women
6. Moumita Biswas	Reality of Online Class in Rural West Bengal
7. Kohinur Khatun	

(Kaustav Bhattacharyya)

Teacher-In-Charge

Karimpur Pannadevi College

P.O.Karimpur,Dist. Nadia

Karimpur Pannadevi College

Estd.- 1968

P.O.- Karimpur, Dist.- Nadia, Pin- 741152, W.B.

E-mail ID : pannadevi_college@rediffmail.com

Website : Karimpurpannadevicollege.ac.in

Ph.- (03471) 255 158, Fax- (03471) 255 158

Ref. No. ..... *Date* .....

From, The Principal / Teacher in - Charge / Secretary

Reference No PLSC/6th_semester/01/2021 09/07/2021

To Whom It May Concern

This is to certify that the following students of the Department of Political Science of Karimpur Pannadevi College, Karimpur, Nadia are pursuing their 6th semester Honours course in Political Science under the University of Kalyani, Nadia, West Bengal. As a part of their course of study, they have to prepare their dissertation under the supervision of Dr. Prasenjit Saha(Assistant Professor, Department of Political Science) by going through a Case study method and for which they have desperately needed some field investigation in certain areas to collect the opinion of the people and other officials related with their respective topics of research. They will be immensely benefitted in their Research work if generous academic supports are available from all concern.

I wish them all success in life.

Group-A

Name of Students-	Topic of Research
1. Sanju Mandal	Child Marriage in Rural West Bengal
2. Sujay Mandal	Political Awareness of Rural Women
3. Juktalekha Roy	Educational Development of Women in Rural West Bengal
4. Moli Das Bairagya	Violence against Women and Safety in Rural West Bengal
5. Barsha Biswas	Health Awareness in Rural Women
6. Moumita Biswas	Reality of Online Class in Rural West Bengal
7. Kohinur Khatun	

(Kaustav Bhattacharyya)

Teacher-in-Charge
Karimpur Pannadevi College
P.O.Karimpur,Dist. Nadia

বিভাগের অন্দরমহল

1st Semester result 2020- 2021) Political Science (Honours)

Sl no:-	Reg. No:-	Name:-	SGPA grade	Marks(%)	Remarks
1	019841	ASIK MASDUD MONDAL	7.70	72 %	
2	019844	MILTON HASAN MONDAL			
3	019837	SOHELI PRAMANIK	7.1	66 %	
4	019848	SOURABH SWARNAKAR	8.10	76.36 %	
5	019830	MOMITA GHOSH	8.00	75 %	
6	019831	NASRIN KHATUN	7.60	71 %	
7	019828	KAJAL KHATUN	7.70	72.36%	
8	019835	SABINA KHATUN	7.70	72.36%	
9	019829	MERINA PARVIN			
10	019827	ANANYA PAUL	8.30	77.45 %	
11	019836	SHRABONI DAS	8.30	74.54 %	
12	019839	SUSMITA MONDAL	7.80	72.36 %	
13	019833	RAHIMA KHATUN			
14	019846	RINTU BISWAS		65.45 %	

2nd Semester result (2020- 2021) Political Science (Honours)

Sl no:-	Reg. No:-	Name:-	SGPA grade	Marks(%)	Remarks
1	019844	ASIK MASDUD MONDAL	8.10%	76	
2	019832	MILTON HASAN MONDAL	7.50%	70	
3	019848	SAURABH SWARNAKAR	8.40%	79	
4	019839	SUSMITA MONDAL	8.10%	76	
5	019831	NASRIN KHATUN	8.40%	79	
6	019827	ANANYA PAUL	8.70%	82	
7	019832	PALLABI BISWAS	7.70%	72	
8	019849	SAWAGATA ROY	8.10%	76	
9	019837	SOHELI PRAMANIK	8%	75	

6th Semester/Final year Result(2018-19 session) Political Science (Honours)

No.	Reg. no-	Name	% of Number	CGPA, GRADE	UNIVERSITY / COLLEGE.
1	018620	SAMIM MONDAL	63.46	6.80	HADISHA LACCHIMUDDIN B. ED. COLLEGE
2	018606	BHASAN SARKAR	65.78	7.20	
3	018589	MOLI DAS BAIRAGYA	69.57	7.51	NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY
4	018593	RAKHI DAS BAIRAGYA	64.27	6.96	
5	018590	MOUMITA BISWAS	63.35	6.93	
6	018622	SANJU MONDAL	75.19	8.11	UNIVERSITY OF KALYANI
7	018583	CHANDRA PRAMANICK	64.00	7.50	NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY
8	018626	SUJOY MANDAL	65.68	7.10	NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY
9	018582	BARSHA BISWAS	70.27	7.56	MURSHIDABAD UNIVERSITY
10	018587	MAMONI BISWAS	64.92	7.01	
11	018585	JUKTALEKHA ROY	68.05	7.40	M. A., University of Kalyani.
12	018599	SUSMITA MONDAL	64.65	6.97	
13	018625	SUDIPTA BISWAS	62.32	6.77	
14	018588	MAMPI MANDAL	63.68	6.99	NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY
15	018627	SUJON SAIKH	64.54	6.96	MURSHIDABAD MINORITY B. ED COLLEGE
16	018608	BISWAJIT PAL	66.70	7.21	VIDYASAGAR UNIVERSITY
17	018614	RAHUL BHATTACHARJE	62.90	6.73	NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY
18	018596	SHYAMASHREE BISWAS	59.19	6.41	
19	018607	BIKRAM HALDER	65.84	7.13	
20	018604	ALAMIN SHAIKH	67.30	7.26	RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
21	018598	SUPRIYA MONDAL	61.84	6.74	
22	018623	SOUMYADIP KARMAKAR	68.32	7.37	B. Ed.
23	018630	TAHIDUL SHAIKH	68.49	7.44	
24	**018595**	**RUNA BISWAS**	**63.95**	**6.87**	
25	**018597**	**SONALI KHATUN**	**65.08**	**6.94**	

* Prepared by: Asom Reja, 5th Semester, Political Science, Honours.

4th Semester result (September – 2020) Political Science (Honours)

Sl no:-	Reg. No:-	Name:-	SGPA grade	Marks(%)	Remarks
1	018542	ASOM REJA	8.77	81.42 %	1st
2	018530	BARSHA KHATUN	8.77	81.14 %	2nd
3	018533	LABONI HALDER	8.46	78.57 %	3rd
4	018536	RICHA SHARMA	8.23	77.71 %	Q
5	018559	SUVOMOY MONDAL	8.46	76.57 %	Q
6	018545	INJABUL HOQUE	8.00	76.00 %	Q
7	018537	RUMANA SULTANA	8.00	74.00 %	Q
8	018535	MILINA KHATUN	8.00	73.71 %	Q
9	018531	FIROJA KHATUN	8.00	73.14 %	Q
10	018543	BAPAN SHAH	7.92	72.85 %	Q
11	018550	RAJESH SHAIKH	8.00	72.85 %	Q
12	018546	MANIRUL SARDAR	8.00	72.57 %	Q
13	018529	ASMINA KHATUN	7.54	71.42 %	Q
14	018540	SUSMITA ROY	7.46	71.14 %	Q
15	018556	SOUVIK GHOSH	7.69	70.57 %	Q
16	018553	SAHIDUL ISLAM SARDAR	7.46	70.28 %	Q
17	018544	BITTU GHOSH	7.46	69.42 %	Q
18	018557	SUJAN SHAIKH	7.69	69.42 %	Q
19	018548	PREMOMOY SHARMA	7.23	68.85 %	Q

প্রাক্তনী সমাচার

স্মৃতি ও ভালোবাসার অনুভূতির বিচারে করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

সঞ্জু মন্ডল (স্নাতকোত্তর প্রথম সেমিস্টার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

২০১৮ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কলেজে ভর্তির কথা ভাবতেই আমার প্রথম করিমপুর পান্নাদেবী কলেজের কথা মনে পড়েছিল , কারণ আমার অনেক দাদা দিদির মুখে এই কলেজের সুন্দর শান্ত পরিবেশ , শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্তরিক ব্যবহারের কথা শুনেছিলাম তাই অন্যান্য কলেজে ভর্তির সুযোগ পেলেও আমি করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ এ ভর্তি হয়েছিলাম রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে। প্রথম দিন কলেজে এসে একটু ভয় হয়েছিল তার সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করেছিলাম নতুন কিছু শেখার আশায় , নতুন কিছু জানার আশায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড: প্রসেনজিৎ সাহা আমাদের ক্লাস নিয়েছিলেন সত্যি কথা বলতে তিনি এত সুন্দর ভাবে ক্লাস নিতেন এবং আমাদের সঙ্গে এত সুন্দর আন্তরিক ব্যবহার করতেন সর্বোপরি তিনি বন্ধুসুলভ আচরণ করতেন , তাই আমরা সকল ছাত্র ছাত্রীরা একই সঙ্গে নিজেদের সকল সুবিধা অসুবিধার কথা জানাতে পারতাম। প্রসেনজিৎ স্যার শিক্ষক-এর মত যেমন পড়াতেন তেমনই কিছু ভুল করলে অভিভাবক দের মত খুব শাসন করতেন আবার একই সঙ্গে বন্ধুর মতো রসিকতা করে আমাদের হাসাতেন । তাই আমরা কেউ কোনো ক্লাস বাদ দিতাম না , সব ক্লাস গুলো করতাম স্যার যদি বিকেল ৪ টের সময় ক্লাস নিতেন তবুও আমরা বসে থাকতাম স্যারের ক্লাস করব বলে কোনরকম ক্লান্তি অনুভব হতো না আমাদের।

প্রথম বর্ষ-এ আমাদের বিভাগে দুজন মাত্র শিক্ষক ছিলেন ড: প্রসেনজিৎ সাহা এবং নির্মল মজুমদার মহাশয়। প্রথম বর্ষে আমাদের নবীন বরণ অনুষ্ঠান হয়েছিল সেই অনুষ্ঠানে আমরা সকলে মিলে আনন্দ করেছিলাম। তবে প্রথম বর্ষের শুরুতেই কয়েক মাস পরই নির্মল মজুমদার মহাশয় বদলি হয়ে যান আমাদের কলেজ ছেড়ে , আমাদের সকলকে ছেড়ে , স্যারের বিদায় সম্বর্ধনার আমাদের বিভাগের সকলে খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। তখন

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সমস্ত দায়িত্বভার এসে পড়েছিল প্রসেনজিৎ স্যার এর উপর , তবুও তিনি নিয়মিত আমাদের ক্লাস নিতেন। আমার এখনো মনে পড়ে প্রসেনজিৎ স্যার সময়ের অভাবে সকাল ১০ টাই আমাদের ক্লাস নিতেন যখন প্রায় কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র ছাত্রীরা ছাড়া কেউ থাকতো না। স্যার কোনদিন ক্লাস নেওয়া বন্ধ করেননি। তারপর আমাদের বিভাগে নতুন অধ্যাপক অধ্যাপিকা আসেন । অধ্যাপক শফিউল ইসলাম স্যার , অধ্যাপক স্বপন কুমার বিশ্বাস স্যার , মৃণাল সিংহ বাবু স্যার , রিঙ্কি বিশ্বাস ম্যাম প্রত্যেকে আমাদের খুব সুন্দরভাবে ক্লাস নিতেন , খুব আন্তরিক ব্যবহার করতেন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে। এছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের আমার সকল সহপাঠীরাও একেবারে নিজেদের পরিবারের মতোই ছিলাম। কোনদিন আমাকে বিভাগের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ঝামেলা-বিদ্বেষ ছিল না। এই ভাবেই আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ আমাদের একটা পরিবার হয়ে উঠেছিল।

আমাদের বিভাগের পক্ষ থেকে একটা ন্যাশনাল সেমিনার আয়োজন করা হয়েছিল , “National Seminar on locating state and society in Indian political thought” এই সেমিনারের দুদিন বিভিন্ন কলেজের, University বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেছিল । এই সেমিনার থেকে আমরা অনেক জ্ঞান লাভ করেছি এবং খুব আনন্দ করেছিলাম। এছাড়া আমাদের বিভাগ থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন হতো যাতে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। তারপর 3rd semester পরীক্ষা দেওয়ার পর মার্চ মাস থেকে Covid নামক ভয়ঙ্কর মহামারীর জন্য লকডাউন শুরু হয়েছিল , তখন থেকে 4th semester , 5th semester , 6th semester পরীক্ষা Online Mode এ দিতে হয়। কলেজ জীবন শেষ করি আমরা, কিন্তু প্রায় ১৬ মাস মত কলেজ জীবনের আনন্দ উপভোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। সরাসরি কলেজে গিয়ে বন্ধু বান্ধবীদের সাথে সময় কাটানো , স্যারদের শাসন , ক্লাস রুমে বসে ক্লাস করা থেকে বঞ্চিত হয়েছি। তবুও বিভাগের প্রত্যেকে আমাদের Google Classroom- এ বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পাঠিয়ে দিয়ে আমাদের সাহায্য করতেন এবং প্রায় প্রতিদিন স্যারেরা আমাদের Google meet- এ ক্লাস নিতেন । তবে এই লকডাউন চলাকালীন যখন আমরা বাড়িতে বসে ছিলাম তখন প্রসেনজিৎ স্যার আমাদের একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র আনার

জন্য আমাদের প্রস্তাব দেয় E-পত্রিকা বের করার , আমরা সকলেই স্যারের এক কথায় রাজি হয়ে যায় এবং এই E-পত্রিকা ছয় মাস পর পর বের হয়। E-পত্রিকাটিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সকল ছাত্র ছাত্রীরা তাদের বিভিন্ন লেখা সকলের সামনে উপস্থাপন করতে পারে। এটি নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী ও অভিনব প্রচেষ্টা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিভা প্রকাশের।

আমাদের কলেজ জীবন শেষ তবুও যখন কলেজের সামনের রাস্তা দিয়ে যাই কলেজের দিকে তাকালেই অনেক স্মৃতি মনে পড়ে যায়। আমরা করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ থেকে অনেক কিছু সুন্দর মুহূর্ত, সুশিক্ষা, অভিনব জ্ঞান ইত্যাদি লাভ করেছি। তাই আমি বা আমরা করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ এবং কলেজের প্রত্যেকটা অধ্যাপক-অধ্যাপিকা বৃন্দের কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ তথা করিমপুর পান্নাদেবী কলেজের সমস্ত অধ্যাপক-অধ্যাপিকা চরণে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

ক্যুইজের উওর মালা

১(খ).২(ক).৩(খ).৪(গ).৫(ক).৬(গ).৭(খ).৮(খ).৯(গ).১০(খ).১১(খ).১২(ক).১৩(গ).১৪(খ).১৫(ক).১৬(খ).১৭(খ).১৮(খ).১৯(খ).২০(খ)

---------O---------

পত্রিকার শ্রদ্ধা বিভাগ যাদের অঙ্কিত চিত্রে ঋদ্ধঃ -

সুজাতা মন্ডল, পঞ্চম সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ,
সাম্মানিক, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

পূর্বের সংখ্যার প্রচ্ছদ ছবিঃ